# ষষ্ঠ অধ্যায়

## *উচ্চবর্গের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও আদিবাসী জীবন*

সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার বিন্যাসের সঙ্গে যুক্ত উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গের ধারণা। "নিম্নবর্গ" শব্দটি ইংরেজি "subaltern" শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ। ইতালির কমিউনিস্ট নেতা ও দার্শনিক আন্তোনিও গ্রামশি ফ্যাসিস্ত শাসক মুসোলিনির জেলে বন্দি থাকার সময়ে লিখিত "Prison Notebooks" গ্রন্থে প্রথম "সাবলটার্ন" শব্দের ব্যবহার করেন। ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞানের পরিসরে বিশ শতকে ঢুকে পড়ল "নিম্নবর্গের"তত্ত্ব। আর সেই সঙ্গে সাহিত্যের পরিসরেও। সমাজবিদ্ পার্থ চট্টোপাধ্যায় লিখছেন গ্রামশি "সাবলটার্ন (ইতালীয়তে সুবলতের্নো) শব্দটি ব্যবহার করেছেন অন্তত দু'টি অর্থে। একটি অর্থে এটি সরাসরিভাবে "প্রলেটারিয়াট'-এর প্রতিশব্দ। পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় "সাবলটার্ন শ্রেণী" হল শ্রমিকশ্রেণী। সামাজিক ক্ষমতার এক বিশেষ ধরনের বিন্যাস ও প্রক্রিয়ার মধ্যে শ্রমিকশ্রেণী শোষিত ও শাসিত হয়।"[১] এই শাসিত ও শোষিত অবস্থানের বিপরীতে যারা দাঁড়িয়ে রয়েছেন অর্থাৎ ক্ষমতার শীর্ষে রয়েছেন যারা, তাদের গ্রামশি বলছেন "হেজেমনিক" বা যারা পুঁজিবাদী বা বুর্জোয়া। শুধুমাত্র পুঁজিবাদী উৎপাদনব্যবস্থায় নয়, গ্রামসি "সাবলটার্ন" শ্রেণির অস্তিত্বের কথা বলছেন শ্রেণিবিভক্ত সমাজের অন্যান্য ঐতিহাসিক পর্বেও। শ্রেণিবিভক্ত সমাজবিন্যাসে "সাবলটার্ন"কে দেখেছেন "ডমিন্যান্ট"-এর বিপরীত মেরু বা অবস্থানে- "এই বিন্যাসকে গ্রামশি দেখেছেন একটি সামাজিক সম্পর্কের প্রক্রিয়ার মধ্যে, যার এক মেরুতে অবস্থিত প্রভুত্বের অধিকারী 'ডমিন্যান্ট' শ্রেণী, অপর মেরুতে যারা অধীন সেই 'সাবলটার্ন' শ্রেণী।"[২] প্রবন্ধ সংকলন *সাবলটার্ন স্টডিজ*-এর সূত্রে যে "নিম্নবর্গের ইতিহাস" বা তত্ত্বের চর্চার সূত্রপাত, সেখানে গ্রামশির ইঙ্গিতগুলোকে অনুসরণ করেই "নিম্নবর্গে"র ধারণার নির্মাণ। এই প্রবন্ধ সংকলনগ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশের পরেই বাংলা ভাষাতেও নিম্নবর্গের চর্চা শুরু হয়। ভারতে নিম্নবর্গের ইতিহাসের প্রবক্তা রণজিৎ গুহের দু'টি বক্তৃতা "এক্ষণ" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। নিম্নবর্গের ইতিহাসের আলোচনা করেছেন তিনি ব্রিটিশ শাসিত উপনিবেশ

ভারতের ক্ষমতাবিন্যাসের প্রেক্ষাপটে, যেখানে তিনি স্পষ্টতই "উচ্চবর্গ" বলতে বুঝিয়েছেন ইংরেজশাসিত ভারতে যারা প্রভুশক্তির অধিকারী। আবার এই প্রভুশক্তিকে বিভাজিত করেছেন দেশি ও বিদেশি শক্তিতে। বিদেশি বা মূলত ইংরেজ শক্তিকে দেখেছেন সরকারি ও বেসরকারি পরিকাঠামোয়। দেশীয় প্রভুশক্তি ওই দুই কাঠামোর সঙ্গে যুক্ত ক্ষমতাবান আঞ্চলিক শক্তি। বিপরীতে "নিম্নবর্গ" হল অবশিষ্ট অংশ- "এর মধ্যে শহরের শ্রমিক ও গরিব, সর্বোচ্চপদের আমলাদের বাদ দিয়ে মধ্যবিত্তের বাকি অংশ, গ্রামের ক্ষেতমজুর, গরিব চাষি ও প্রায়-গরিব মাঝারি নিম্নবর্গের মধ্যে গণ্য। তা ছাড়াও এই সংজ্ঞার শুদ্ধ অর্থে গণ্য হবে নির্বিত্ত ভূস্বামী, অপেক্ষাকৃত হীনবল গ্রামভদ্র, অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন মাঝারি কৃষক এবং ধনী কৃষকেরাও।"[৩] শ্রেণিবিভক্ত অসম বিকাশের সমাজব্যবস্থায় পিরামিডে ক্ষমতা, কর্তৃত্ব, আধিপত্য ও প্রভুত্ব উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গের মেরুকরণ করে। সমাজের বিভিন্ন ঐতিহাসিক পর্বে সামাজিক, আর্থিক ক্ষমতায় উচ্চবর্গ পিরামিডের চূড়ায় অবস্থান করলে, নীচের তলায় থাকে নিম্নবর্গ। শুধুমাত্র পুঁজিবাদী ব্যবস্থাতেই নয়, প্রাক্-ঔপনিবেশিক যুগ থেকে উপনিবেশ-পরবর্তী সময়েও ক্ষমতা ও অধীনতার সূত্রে নিম্নবর্গের অবস্থান পাল্টায়নি। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আধিপত্যকে কেন্দ্র করেই উচ্চবর্গ-নিম্নবর্গের শ্রেণি বিভাজন। এর সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় নিম্নবর্গের চেতনায় একধরনের অধীনতার মানসিকতা কাজ করে যা উচ্চবর্গের এই আধিপত্যকে নিজের অজান্তে বা জ্ঞাতসারে মেনে চলে। জহর সেনমজুমদার মনে করেছেন চৈতন্যকেন্দ্রিক নবজাগরণ বা উনিশ শতকের নবজাগরণ কোনওটাই নিম্নবর্গের বাস্তব উপকার করতে পারেনি; বরং তার সুফল ভোগ করেছিল যে মধ্যবিত্ত শ্রেণি, তারাও নিম্নবর্গের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছিল, কখনও নিম্নবর্গের বিপরীত মেরুতে যেতে যেতে মিশে গেছিল বুর্জোয়া শ্রেণির সঙ্গে।[৪] অসম বিকাশ ও শ্রেণিবিভক্ত সমাজব্যবস্থার ভারতে আদিবাসীরা আর্থ-সামাজিক ক্ষমতাবিন্যাসে চিরকালই

"নিম্নবর্গ"। বাংলা উপন্যাসে এই আদিম অধিবাসীদের প্রতি উচ্চবর্গের মানুষের মানসিকতার যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাকে এই অধ্যায়ে তুলে আনার প্রচেষ্টা আছে।

জহর সেনমজুমদার বিভিন্ন ঐতিহাসিক পর্বে নিম্নবর্গের স্বরূপ সন্ধান করতে গিয়ে দেখিয়েছেন-

"প্রাক ঔপনিবেশিক যুগ- বর্ণের দিক থেকে মানুষ নিম্নবর্গ

ঔপনিবেশিক যুগ- শিক্ষার দিক থেকে মানুষ নিম্নবর্গ

উত্তর ঔপনিবেশিক যুগ- অর্থের দিক থেকে মানুষ নিম্নবর্গ"[৫]

প্রথমোক্ত নিম্নবর্গের সন্ধান আমরা পাই মহাশ্বেতা দেবীর *বন্দ্যঘটী গাঞির জীবন ও মৃত্যু* উপন্যাসে। উপন্যাসটির প্রকাশকাল ১৯৬৭ সাল, কাহিনির সময়কাল বঙ্গদেশে যখন মধ্যযুগ, সমাজে চৈতন্যপ্রেমের জোয়ার চলছে; অথচ উপন্যাসটি ভারতের সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক প্রেক্ষিতে সাম্প্রতিকতম সময়েও প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে জাত-পাত চর্চার প্রসঙ্গে। রাষ্ট্র যখন সাম্য ও মানবতার ধারণা থেকে সরে এসে ব্রাহ্মণ্যবাদকে আশ্রয় করে জাত-পাতের চর্চায় মগ্ন থাকে বা তাকে এড়াতে পারে না, সমাজে তখন আসলে ঘৃণার স্রোত প্রবাহিত হয়। উপন্যাসজুড়ে এই ঘৃণা ও হিংসাকেই প্রত্যক্ষ করা যায়। এই উপন্যাস আসলে ব্রাহ্মণ্যবাদকে অস্বীকার করে একজন চুয়াড় যুবকের কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার লড়াই। উপন্যাসের পটভূমি রূপনারায়ণের কুক্ষিতে বা রূপনারায়ণ নদ দিয়ে প্রায় ঘিরে থাকা ভীমাদল নগরী। ভীমাদল যখন গ্রাম ছিল অর্থাৎ বর্তমান রাজার পিতামহ যখন রাজ্য শাসন করছেন, বঙ্গদেশজুড়ে তখন চৈতন্য প্রবর্তিত মানবতার প্লাবন। জাত-পাত নির্বিশেষে সকল মানুষের কাছে শ্রীচৈতন্য কৃষ্ণনামের দ্বার খুলে দিয়েছেন। গর্গবল্লভের পিতামহ এই চৈতন্য প্লাবনকে আঁচ করতে পারেননি, অথচ মহাপ্রভুর আঠারো বছরের নীলাচল জীবনে বৈষ্ণব আচার্যরা কীর্তন করতে করতে ভীমাদলের পথ দিয়ে যেতেন এবং পথের দু'ধারের মানুষকে হরিনামে আনন্দ দিতেন।

গর্গবল্লভের পিতামহ চৈতন্যের উদার মানবতার প্রভাবকে উপলব্ধি করতে না পারলেও গর্গবল্লভ অনুভব করেছিলেন একদিকে চৈতন্যের উদার মানবতাবাদী ধর্ম, অন্যদিকে আকবর প্রবর্তিত ইসলামী উদারতা ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের প্রতাপকে ক্ষুণ্ণ করেছে। ব্রাহ্মণ্যবাদের দাপটে যে সব নীচু জাতের মানুষেরা ব্রাহ্মণের পায়ের নীচে কাদার মতো বাস করত, সেই সব বারুই-তিলি প্রমুখেরাও উদার মানবতার হাওয়ায় নিজেদের মানুষ বলে দাবি করে। মানুষের অধিকারে প্রতিষ্ঠা পেতে চায়। ভূপতি গর্গবল্লভ মনুবাদী হিন্দু ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রকে ভীমাদলে কঠোরভাবে বলবৎ রাখতে চান। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়- "মনু সংহিতা থেকে বর্ণ ভিত্তিক মানুষকে পৃথকীকরণ ও শোষণের শুরু।...মনুসংহিতা কথিত ব্রাহ্মণ কেবল ব্রাহ্মণ্যবাদী হবেন এমন না- যে কোন জাতির মানুষ ব্রাহ্মণ্যবাদী হতে পারেন। কারণ মনু সৃষ্ট সমাজ ব্যবস্থায় ব্রাহ্মণ শ্রেণীর ভূমিকাই ক্ষত্রিয় শ্রেণীর রাজনৈতিক ক্ষমতা ও বৈশ্য শ্রেণীর কায়েমী আর্থিক স্বার্থকে বজায় রাখতে সাহায্য করেছে। ব্রাহ্মণদের সৃষ্ট ধর্মীয় আচার ও শাস্ত্রীয় অনুশাসনের মাধ্যমে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য শ্রেণীই সাধারণ মানুষের উপর শাসনই শোষণ চিরায়ত করেছ।"[৬] ভূপতি গর্গবল্লভ মাধবাচার্য ভীমাদলে আসার আগে ও পরে মূলত যাঁর সাহায্যে সমাজে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রকে কায়েম রাখতে পেরেছিলেন, তিনি হরিশ রায়া বা সুধন্য দত্ত। হরিশচন্দ্র যেমন জন্মসূত্রে নয়, পরবর্তীকালে কর্মের ফলে চণ্ডাল হয়ে গিয়েছিলেন, তেমনি সুধন্য রায়ও স্বভাবধর্মে চণ্ডাল হয়েছিলেন বলেই ওই নামে তিনি কুখ্যাত হন। ভীমাদলের কেউ তাঁকে কখনও হাসতে দেখেনি। ঔপন্যাসিক লিখছেন- "বড় নিষ্ঠুর তিনি, বিনাক্রোধে শিশুহত্যা করতে পারেন।...ঘোর বৈষ্ণব বিরোধী। ব্রাহ্মণ্যধর্মের মাহাত্ম্য রাখবার জন্য তাঁর চেষ্টার শেষ নেই।"[৭] গোলকশুঁড়ি স্মরণ করতে পারে এক গৌড়ীয় ব্রাহ্মণের রূপনারায়ণ নদের ধারে পিতৃকাজের সময় ভুলক্রমে আতপচালের সরায় জল ছিটিয়েছিল মদন নিকিরীর ছেলে। এই অপরাধে মদন নিকিরীর হাত কেটে নিতে উদ্যত হয়েও মদনের মায়ের নিরন্তর

কান্নায় তা শেষপর্যন্ত চুড়ণ চণ্ডালের কাছ থেকে ষোল ঘা বেত্রাঘাতে থামে। এই ঘটনাটি ব্রাহ্মণ্যবাদের নিগড়ে সাধারণ নিম্নবর্গ ও এখানে নিম্নবর্ণের মানুষদের সামাজিক অবস্থানটি ও অত্যাচারের স্বরূপটি স্পষ্ট করে। মাধবাচার্য ভীমাদলে এসে নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য ছলনার আশ্রয় নিয়ে রাজ্য বাঁচাবার উপায় হিসেবে গুপ্তপূজার নিদান দিলেন, সেই পূজার মূল উপাচার ফুল বা ফল নয়, নরবলি। এক অনাথ অন্ত্যজ চুয়াড় বালকের রক্তে মাধবাচার্যের ভীমাদলে আধিপত্যের প্রতিষ্ঠা। নিন্দুকেরা বলে, রূপনারায়ণ নদকে শান্ত করতে মুণ্ডঘাট নির্মাণের সময় মাধবাচার্য শুধু শ্মশানের নরকপাল এনেই পোঁতাননি, পুঁতেছিলেন জ্যান্ত মুণ্ডুও। গর্গবল্লভের পিতা দেবীমন্দির প্রতিষ্ঠার সময় বলি দিয়েছিলেন বারোজন চণ্ডালকে। *মনুসংহিতায়* (১১/১৩১ সংখ্যক শ্লোক) শূদ্রহত্যায় প্রায়শ্চিত্ত নগণ্য বলা হয়েছে– "মার্জারনকুলৌ হত্বা চাষং মুণ্ডূকমেব চ।/ শ্বাগোধোলূককাকাংশ্চ শূদ্রহত্যাব্রতং চরেৎ।। (বিড়াল, নেউল, চাষপাখী, ব্যাঙ্, কুকুর, গোসাপ, প্যাঁচা বা কাক মেরে শূদ্রহত্যার প্রায়শ্চিত্ত করবে)।"[৮]

দণ্ডকারণ্য থেকে কলিঙ্গ হয়ে মেদিনীপুর পর্যন্ত গভীর নিদয়ার জঙ্গল। ভীমাদল নগরের শেষে এই জঙ্গলেই চুয়াড়দের বাস, এই ব্যাধেরা নিজেদের একলব্যের স্বজাতি বলেই মনে করে। তাই, চুয়াড়দের রাজা তাঁর বৃদ্ধাঙ্গুলি কেটে ফেলেই রাজা হন। কাশীরাম দাসের *মহাভারতের* "আদি পর্বে" আছে নিষাদ হিরণ্যধনু পুত্র একলব্য দ্রোণের কাছে ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা গ্রহণ করতে চাইলে নীচজাতিহেতু দ্রোণ তা প্রত্যাখ্যান করেন। একলব্য অথচ দ্রোণকেই মনে মনে গুরু স্বীকার করে ধনুর্বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে ওঠে, একলব্যের দক্ষতা অর্জুনের শ্রেষ্ঠত্বকে প্রতিহত করতে পারে বুঝেই দ্রোণ সেদিনের প্রত্যাখ্যাত একলব্যের কাছে গুরুদক্ষিণাস্বরূপ ডানহাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি চেয়ে নেন।– "দ্রোণ বলিলেন যদি আমারে তুষিবে।/ দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধ অঙ্গুলিটা দিবে।।/ একলব্য ইহা শুনি বিলম্ব না কৈল।/ অঙ্গুলি কাটিয়া তাঁর চরণেতে দিল।।"[৯] এইভাবেই একলব্যের আত্মদানে ওপরেই অর্জুনের শ্রেষ্ঠত্বের সৌধ

নির্মিত হয়েছিল। দুর্ধর্ষ ধানুকী নিদয়ার জঙ্গলের এই চুয়াড়রা। বন্দ্যঘটী নাম নেওয়া কল্‌হনও সবাইকে চমকে দিয়ে রাজার সামনে বাদিয়াদের দেওয়া লক্ষ্যভেদ করেছিল নিপুণ দক্ষতায়। ঔপন্যাসিক শুধু একজন চুয়াড় যুবকের ‘‘কবি’’ হওয়ার লড়াই, অন্ত্যজদের প্রতি উচ্চবর্ণের নিগ্রহকেই রূপায়িত করলেন না, এই উপন্যাসে তুলে আনলেন নিদয়ার জঙ্গলে বসবাসকারী আদিবাসী চুয়াড়দের বিশ্বাস-প্রথা-সংস্কার, টোটেম ও ট্যাবুকে। তিনি বলছেন- “আমরা ও তারা একই ভূ-খণ্ডে বাস করি কিন্তু তাদের ধ্যানধারণার জগৎ একেবারে পৃথক, আজও পৃথক, এবং এই দুই জগৎ দুই অস্তিত্বের ব্যাপারটিও আমাকে প্রলোভিত করেছিল। এদের প্রসঙ্গেই আমি আদিম এক অরণ্যহস্তিযূথের প্রতীক ব্যবহার করেছি। যে হস্তিযূথ অজিত প্রকৃতির শেষ সম্মানিত প্রতিভূ। পালকাপ্য মুনির আশ্চর্য কাহিনীটি এক আশ্চর্য পুরাকল্পের মতই মনে হয়েছে আমার।”[১০] উপন্যাস অংশে পালকাপ্য মুনির কাহিনি প্রসঙ্গেও যুগ যুগ ধরে নিম্নবর্গের মানুষদের ওপর উচ্চবর্গের শোষণের ইতিহাস উঠে আসে। উঠে আসে তাদের জঙ্গলবাসের কারণ। চুয়াড়দের কথ্যঐতিহ্যে আছে এই পালকাপ্য মুনি হাতিদের সঙ্গে বাস করতেন। একদিন এক লোভী রাজা সমস্ত হাতি নিয়ে চলে গেলে মুনি নির্বাসনে থাকেন। এমনসময় ক্ষুধা তৃষ্ণায় জীর্ণ পালকাপ্য মুনিকে বুকের দুধ দিয়ে বাঁচিয়েছিল এক চুয়াড় রমণী। নারকেল এনে দিয়েদিল এক চুয়াড় যুবক। ব্রাহ্মণকে বুকের দুধ দেওয়ার মহাপাপে মরতে হয়েছিল সেই চুয়াড় রমণীকে, ফল পেড়ে দেওয়ার মহাপাপে চুয়াড়দের ঘর ভেঙে তাদের গৃহহীন করে দিয়েছিল সেদিনের উচ্চবর্ণের মানুষেরা। পালকাপ্যই সেদিন চুয়াড়দের জঙ্গলে আশ্রয় দিয়েছিলেন। হাতিরাই তাদের রক্ষা করবে জঙ্গলে, কিন্তু ততদিনই যতদিন না চুয়াড়রা হাতিদের ত্যাগ করছে; ত্যাগ করলেই হাতির পায়ের তলায় মৃত্যু নিশ্চিত। সেই থেকে চুয়াড় সমাজে সমাজত্যাগ নিষিদ্ধ, এই ট্যাবু ভাঙলে হাতির পায়ের তলায় ফেলে মৃত্যুর শাস্তি দেওয়া হয়। নিষিদ্ধ মৈথুনকালে, প্রসবকালে

এবং মৃত্যুকালে হাতির কাছে যাওয়াও। জঙ্গলের মধ্যে থেকেও চুয়াড়রা রাজার বিশ্বস্ত। যুদ্ধকালে তির-ধনুক হাতে রাজার হয়ে যুদ্ধ করে ফিরে যায় নিজেদের অরণ্যে, বাসভূমিতে। নিজেদের সমাজের পরিচালনা, বিচার তারা নিজেরাই করে, শুধুমাত্র গোষ্ঠীগত বিপন্নতায় তারা রাজার কাছে আসে, সেইসময় রাজা তাদের কথা শুনতে ও বিচার করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

এই সামাজিক ও রাষ্ট্রিক পটভূমিতে চুয়াড় যুবক কল্‌হনের "কবি বন্দ্যঘটী" হওয়ার রক্তাক্ত যাত্রা। চুয়াড় সমাজে তির-ধনুক ছেড়ে অক্ষর শিক্ষা স্বীকৃত নয়, অথচ ছোটো থেকেই কল্‌হনের অক্ষরের ওপর অপরিসীম আকর্ষণ। এক রোগগ্রস্ত সন্ন্যাসীকে সেবা করে তাঁরই সহায়তায় লোহার শলা দিয়ে মাটিতে আঁক কেটে সে শিখে ফেলেছিল অক্ষর। নিজেকে কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে নাড়ির টান, শিকড়, জন্মপরিচয়কে পেছনে ফেলে এসেছে সে। একজন্ম থেকে থেকে আরেকজন্মে পথ হেঁটেছে। রাজাকে পরিচয় দিয়েছেন এই বলে– "পিতামাতা বন্ধুভ্রাতা ছিলা যতজন/ কেহ করে নাই মোর এ নামকরণ।"[১১] উপন্যাসে কবির দৈহিক বিবরণ যা পাওয়া যায়, তাতে সে সিংহস্কন্ধ, কাঁধ অতিরিক্ত চওড়া, শালগাছের মতো সতেজ ও সবল চেহারায় নিকষ কালো চুল ঢেউ খেলানো এবং কাঁধ পর্যন্ত প্রসারিত। গলা, হাত ও কাঁধের পেশির দৃঢ়তা তির ছোঁড়া অভ্যাসের পরিচয় বহন করে। নিজের মধ্যে কবিসত্তার অনুরণন চুয়াড় কল্‌হন যে অনুভব করত, সেই কথা বলতে গিয়ে তার অতীতের তিরাভ্যাসের প্রমাণ মেলে- "আমি শিকার খেলি, বাণের মুখে বাঘ বিন্ধি, আর থাকি জঙ্গলের ভিতর যেঞে বসি। হাতির পাল খেলে, কুন্দে, জল ছেটে, তাই শুনে শুনে আমার মনে পাঞ্চালী উঠে আসে। পাঞ্চালী রচব হে, পাঞ্চালী বান্ধব, এই কথাটি সোঙরে সোঙরে আমার অঙ্গ বেথা করে।"[১২] অথচ চুয়াড় সমাজে কেউ খাগের কলম, মসিপাত্র ব্যবহার করে না, তাই মাতৃস্নেহহীন কল্‌হন চুয়াড় সমাজের সঙ্গে একাত্ম অনুভব করতে পারে না। অবশেষে নিজের অস্তিত্বের সন্ধানে, কবি হিসেবে

নিজেকে প্রতিষ্ঠা দিতে নিজের সমাজ ত্যাগ করে সে, সেই ত্যাগের পরিণতি ধরা পড়লে মৃত্যু জেনেও। কবি হওয়ার যাত্রায় কবির সাধনার স্বরূপটা ঔপন্যাসিক স্পষ্ট করলেন একটি লাইনে- "যুবকের কথা বড় পরিষ্কার, শুদ্ধ এবং স্পষ্ট উচ্চারণ, যেন এ কথ্য ভাষা তাঁর চেষ্টা করে শেখা।"[১৩] ভীমাদলের রাজা যখন নিজের মাহাত্ম্য স্থায়িত্বের জন্য কোনো এক "কবি"র আকাঙ্ক্ষা করছেন, ঠিক তখনই কল্‌হনের আগমন। কবি বন্দ্যঘটী গাঞিকে সাদরে গ্রহণ করলেন রাজা। তাঁর রচিত "অভয়ামঙ্গল" ভীমাদল রাজ্য ও তাদের রাজাকে অক্ষয় মহিমা প্রদান করবে। বর্ণব্যবস্থাভিত্তিক সমাজব্যবস্থায় মানুষের মনস্তত্ত্ব বুঝতে অক্ষম বন্দ্যঘটী ভেবেছিল তার কাব্যের মধ্যে যেহেতু সকলকে স্থান দিয়েছে, অমর করে রেখেছে, তাই সকলেই তাকে ভালোবাসবে- "যেন উত্তম কাব্যের এমনই গুণ, যে তার প্রভাবে মানুষ স্বভাব পরিত্যাগ করবে।"[১৪] অথচ বিচারকালে সে বুঝেছে ঘৃণার স্রোত কেমন অন্তঃসলিলার মতো সমাজে প্রবাহিত ছিল। হাতি দিয়ে মৃত্যুর শাস্তির দেখতে লোক জড়ো হয়, কামার এসে চেয়ে নিয়ে যায় হাতিমারা বন্দির বাঁ-পায়ের নখ, কারণ সেই নখের মাদুলির প্রভাবে তার ছেলে হবে। অথচ বন্দ্যঘটী উত্তর পায় না- "কিন্তু আমি মানুষের সমাজে কোন দোষে দোষী হলাম সেইটি বোল মহারাজ।"[১৫] বোঝেনি সে শূদ্রের স্পর্ধায় দোষী। ভীমাদলের ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজে দাঁড়িয়ে কবি ব্যক্তিমানুষের অধিকারের দাবি জানিয়েছেন। মহাপ্রভুর উদার মানবতা ও চণ্ডীদাসের মানুষের জয়গান তাকে প্রভাবিত করেছিল। কিন্তু ষোড়শ শতকে গোঁড়া ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজ নিম্নবর্গের অধিকারকে স্বীকৃতি দেয় না বলেই চুয়াড়ের কবিজন্মকে মহাপাপ বলে গণ্য করা হয় এবং স্পর্ধাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। গর্বের অভয়ামঙ্গলের চিহ্নটুকুও রাখতে চান না রাজা। কবির নাম উচ্চারণও নিষিদ্ধ হয় ভীমাদলে। কারণ, মানবতার অস্তিত্বকে অস্বীকার করা ব্রাহ্মণ্যবাদীরা ভয় পেয়েছিল তাদের ক্ষমতার সৌধ ভেঙে যেতে পারে শুধুমাত্র নিম্নবর্গের মধ্যে এই চেতনার জাগরণে যে, নিম্নবর্ণের

মানুষ-যাদের পেছনে টেনে রাখা হয়েছে তারাও কবি হতে পারে, ব্যবসায়ী হতে পারে, রাজা হতে পারে।

বন্দ্যঘটী তার কাব্যে কুমার-সুলভার প্রেমের উদ্যান রচনা করেছে। মাধবাচার্যের কন্যা ও কবির বাগদত্তা ফুল্লরার মধ্যে সেই সুলভার খোঁজ করেছে নিরন্তর, যে কুমারের প্রেমে, কুমারের খোঁজে উন্মাদিনীর ন্যায় ঘুরে বেড়ায়। ভেবেছিল জাত-পাতের তুচ্ছতা ভেসে যাবে প্রেমের কাছে। যে ভালোবাসা একদিন গুণা আয়িকে দিয়ে তুক্ তাক করে কবিকে ধরে রাখতে চেয়েছিল, সেই ভালোবাসার মানুষটি চুয়াড় জেনে নিষ্ঠুর প্রত্যাখ্যান করেছিল। আসলে, ফুল্লরার কবিকে কামনার মধ্যে প্রেমের দৃঢ়তা ছিল না। ঔপন্যাসিক ফুল্লরার মধ্যে অন্ত্যজদের প্রতি আদিম ঘৃণাকে স্পষ্ট করলেন এইভাবে- "ফুল্লরার শরীরের রক্ত বিমুখ হল, নাড়ীর রক্ত মুখ ফিরিয়ে উল্টো দিকে বইল। শরীরের মাংসে যে দুটি মূলকৃমি থাকে তারাও মোচর দিল। ঘৃণায় চামড়া রী-রী করল, 'সাবধান ছুঁয়ো না !' বলে ফুল্লরা চীৎকার করে উঠল।"[১৬] ফুল্লরার ঘৃণা ও প্রত্যাখ্যান কবিকে কল্হন জন্মের আকাশীর নিখাদ প্রেমের কথা স্মরণ করায়, অথচ সেই প্রেমকে কল্হন একদিন ঘৃণায় প্রত্যাখ্যান করেছিল- "কিন্তু এখন কবির মনে হয় আকাশী বুঝি সেই অরণ্য যুবতীবেশী চণ্ডিকার মতই মমতাময়ী ছিল। সামনে আসত না, কেন না ওর কানের পলা, গলার কাঁটিমালা, নিকষ কালো রঙ দেখলে কবির ঘেন্না হত, কবি মুখ ফেরাতেন।"[১৭] নিজের মধ্যে কবিসত্তা অনুভব মাত্রেই কল্হন চুয়াড় সমাজের সঙ্গে কোনও আত্মিক যোগ আর অনুভব করেনি, জন্মপরিচয়কে সে শুধু অস্বীকারই করেনি, তাকে ঘৃণা ও উপেক্ষাও করেছে। তাই তার কাব্যে জায়গা হয়নি চুয়াড়দের, তাদের পালকাপ্য মুনির কথা সে লেখেনি, গুণা আয়ির প্রতি ঘৃণা অনুভব করেছিল সে চুয়াড় রমণী জেনেই। তবুও শেষপর্যন্ত কল্হন ফিরে গেছে শৈশবের বাসভূমি জঙ্গলে, ফিরে গেছে জন্মগত ট্যাবুতে- যেখানে মৈথুনরত অবস্থায়

হাতিদের দেখা মহাপাপ। ক্ষমা চেয়েছে পালকাপ্য মুনির কাছে, স্মরণ করেছে মমতাময়ী আকাশীকে। জঙ্গলে কখনও অভয়ার আশ্রয় পেতে চেয়েছে, কখনও অভয়ার স্বপ্নদর্শনের মিথ্যে বলার জন্য ক্ষমা চেয়েছে, কখনও অনুযোগ করেছে। কবির মনের মধ্যেও প্রোথিত হয়ে গেছিল কি উচ্চবর্ণীয় ঘৃণার বীজ? নইলে দেবীর উদ্দেশ্যে অনুযোগে কেন বলছেন- "পাঁকে জন্ম নিলে পাঁকে পড়ে পচতে হবে?"[১৮] কল্‌হনের পরিণতি কোথাও একটা এই ইঙ্গিতও বহন করে উচ্চবর্ণীয় ঘৃণার রাজনীতি থেকে সমাজের মুক্তি ভিন্ন ব্যক্তিমানুষের মুক্তি নেই।

সমাজবিদ্ পার্থ চট্টোপাধ্যায় "নিম্নবর্গে"র আলোচনা প্রসঙ্গে *সাবলটার্ন স্টাডিজে* যে তিনটি বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়েছে মনে করেছেন, তার মধ্যে অন্যতম মেয়েদের সামাজিক অবস্থান সংক্রান্ত। তিনি মনে করেন- "পুরুষশাসিত সমাজে সব নারীই এক অর্থে নিম্নবর্গ। কিন্তু তাই বলে নারীর কোনও শ্রেণীগত, জাতিগত, সম্প্রদায়গত পরিচয় নেই, এও সত্য নয়। সুতরাং নিম্নবর্গের নির্মাণ দেখতে হলে পুরুষশাসিত সমাজে নারীর অধীনতাও যেমন বিশ্লেষণের বিষয়, তেমনি অন্যান্য ক্ষমতার সম্পর্ক, যেমন শ্রেণী, জাতি, সম্প্রদায়, ইত্যাদি কীভাবে সেই নিম্নবর্গীয় নারীর নির্মাণটিকে আরও জটিল করে তোলে, তাও বিশেষ গবেষণার বিষয়।"[১৯] নারীর প্রতি সামগ্রিকভাবে পুরুষশাসিত সমাজের দৃষ্টিভঙ্গিটা যখন নিম্নবর্গের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি ও শোষণ-বঞ্চনার সমরূপ, তখন প্রান্তিক, নিম্নবর্ণ ও আদিবাসী নারীদের প্রতি শ্রেণিবিভক্ত সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির স্বরূপ বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় *অরণ্যের দিনরাত্রি* (১৯৬৮) উপন্যাসে কলকাতা থেকে আগত চারবন্ধুর ধলভূমগড়ের আদিবাসী মেয়েদের প্রতি মানসিকতার পরিচয় তুলে ধরেছেন। ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থায় ইংরেজ সরকার নিজের মুনাফা লোটার জন্য এদেশে জমিদার ও মধ্য স্বত্বভোগী শ্রেণির জন্ম দিয়েছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে ১৮৭২ সালে জমিদারের সংখ্যা ১৭৭২ সালে ১০০র

কাছাকাছি থেকে প্রায় দেড় লক্ষ। অন্যদিকে, ১৮৪২ সাল পর্যন্ত এদেশে ভূমিহীন কৃষক প্রায় ছিলই না, কৃষক ছিল মূলত জমির মালিক, ১৮৭২ সাল নাগাদ সেই ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যাটা দাঁড়ায় প্রায় ৭৫ লক্ষে। ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই এই জমিদারি প্রথার বিলোপের লক্ষ্যে আইন প্রণীত হয়। ১৯৪৯ সালে বিহারে জমিদারি প্রথা বিলোপের আইন পাশ হয়। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় ১৯৫৩ সালে জমিদারি অধিগ্রহণ আইন পাশ হয়। অথচ দেখা গেল, পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারসহ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে এই আইন প্রহসনে পরিণত হয়েছে। জমিদাররা বেনামে জমির হস্তান্তর করতে থাকে এবং হাজার হাজার কৃষকের উচ্ছেদ হয়। ফলে, উপনিবেশিক-উত্তরকালেও ভারতের কৃষিব্যবস্থায় উৎপাদন-সম্পর্ক ও ভূমিহীন কৃষকদের অবস্থার পার্থক্য ঘটেনি। প্রফুল্ল রায় *আকাশের নীচে মানুষ* (১৯৮১) উপন্যাসে ছোটোনাগপুর অঞ্চলের কোয়েল নদীর প্রান্তবর্তী গারুদিয়া গ্রামের জনজীবন ও আইনত বিলুপ্ত হওয়া জমিদারি শাসন-শোষণ বহাল থাকার এক নিষ্ঠুর কাহিনি তুলে ধরলেন। গারুদিয়া গ্রামের সমস্ত জমিজমার মালিক রঘুনাথ সিং। রাজপুত ক্ষত্রিয় তিনি। ঔপন্যাসিক বলেন– "ইন্ডিয়ান পার্লামেন্ট যত আইনকানুনই পাশ করুক, দিল্লী থেকে দু'-আড়াই হাজার কিলোমিটার পার হয়ে তার খুব সামান্যই এখানে এসে পৌঁছতে পারে। নিজের ইচ্ছেমতো কিছু আইনকানুন তৈরি করে পুরনো ফিউডাল সিস্টেমটাকে প্রায় পুরোপুরিই বজায় রেখেছেন রঘুনাথ।"[২০] ক্ষমতার বিন্যাসের অবস্থানে সে উচ্চবর্গীয় এবং হিন্দু বর্ণব্যবস্থায় উচ্চবর্ণীয়। ভারতে জমিদারি প্রথা স্বাধীনতার পর পরই আইন করে উঠে গেলেও সেই আইনের ফাঁক বুঝে নিতে অসুবিধা হয়নি রঘুনাথের। ফলে রাষ্ট্রের দায়িত্বহীনতায় অসচেতন মানুষদের ভুল বোঝায় রঘুনাথের লোক- "এবার থেকে তোরা জমিজমা খেতখামারের মালিক বনলি। বড়ে সরকার কিরপা করে তোদের নামে জমিন লিখে দিলেন।...অ্যায়সা অ্যায়সা তো দুনিয়ায় কিছু হয় না। থোড়ে থোড়ে দাম দিতে হয়। বড়ে

সরকারের খেতিতে আগের মতো কামকাজ করে যা। একরোজ জমিন-উমিন মিলে যাবে।"[২১] জমির মালিক হওয়া ধর্মাদের হয় না। সরকারি আইনের জেরে বিপুল পরিমাণ জমি নিজের নামে রাখতে অপারক রঘুনাথ এই সমস্ত কৃষকদের বেনামে জমি রাখেন অথচ মালিকানা দেন না। স্বাধীন ভারতে ভূমিসংস্কার আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ভূমিদাস প্রথা বজায় রাখেন। আঙুলের ছাপে কোনো এককালে ঋণ নেওয়ায় বদলে ধর্মা ও ধর্মার মতো দোসাদটোলার অনেকে পুরুষানুক্রমে "বেগার" বা ভূমিদাস হয়ে যায়। শুধুমাত্র ভূমিদাসদের অজ্ঞতা নয়, রঘুনাথ এই ব্যবস্থা চালু রাখেন মাইনে করা পালোয়ান দিয়ে, চর দিয়ে। এই উপন্যাস ধর্মার ক্রীতদাসের ঘৃণ্যজীবন থেকে মুক্তির স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের কাহিনি। যে অধীনতার চেতনা নিম্নবর্গীয়কে নিস্ক্রিয় ও অনুগত জীব করে রাখে, সেই চেতনায় কঠিন আঘাত করলেন ঔপন্যাসিক, উপন্যাসের শেষে ধর্মার মুখে শোনালেন এমন কথা যা উচ্চারণ করতে তাদের লেগে গেল কয়েকশো বছর- "ঝুট ঝুট ঝুট। তু হামনিকো আদমী নেহী। তুই আমাদের লোক না, আমাদের লোক না, আমাদের লোক না-"[২২]

ধর্মারা জাতে দোসাদ। এই দোসাদরা মূলত বিহারের একটি জাতি। উপন্যাসে দেখা যায় ধর্মারা "অচ্ছুৎ"। হিন্দু বর্ণব্যবস্থায় নিপীড়িত, অবহেলিত ও অন্ত্যবর্ণরা দীর্ঘদিন ধরেই উচ্চবর্ণ দ্বারা অস্পর্শীয়। বিশ শতকের তিরিশের দশকের কাছাকাছি সময় থেকে এরা নিজেদের "দলিত" বলে পরিচয় দেয়। ব্রিটিশ শাসকরা যাদের "depressed class" বলে উল্লেখ করেছিল, মূলত তারাই এই "দলিত" শ্রেণি। উপন্যাসে অস্পৃশ্যতার ঘৃণ্য নিদর্শন ঔপন্যাসিক রেখেছেন নানাভাবে, কোথাও তাদের বাসস্থান বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন –"বাজার-গঞ্জ আর ভারী ভারী টৌন থেকে অনেক দূরে অচ্ছুৎ ভূমিদাসেরা পৃথিবীর সবটুকু ঘৃণা গায়ে মেখে বংশ পরম্পরায় এখানে পড়ে আছে।"[২৩] অথচ স্বাধীনভারতে অস্পৃশ্যতা অপরাধ। সংবিধানবিরোধী। সংবিধানের ১৭নং ধারায় অস্পৃশ্যতা উচ্ছেদ

নাগরিক অধিকার স্বীকার করা হয়েছে। ১৯৫৫ সালেই অস্পৃশ্যতাকে অপরাধ আইনে ফেলা হয়। পরবর্তীকালে অস্পৃশ্যতাজনিত নৃশংসতা রোধ আইনে [The Scheduled Caste and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Rules, 1995, dt 31st March, 1995 G.S.R 316(E)] সুরক্ষা দেওয়া হয়েছে তপশিলি জাতি ও  তপশিলি উপজাতিদের। অথচ গারুদিয়া গ্রামে অস্পৃশ্যতার শিকড় উচ্চবর্ণের মানুষের মনে অনেক ভিতর পর্যন্ত গ্রথিত। সামান্য খোরাকিতে গারুদিয়া গ্রামের ভূমিদাসরা পুরুষানুক্রমে বাঁধা হয়ে থাকে রঘুনাথের। এমন গারুদিয়াতেও স্বাধীন ভারতের গণতান্ত্রিক উজ্জাপন নিয়ে আসে সংসদীয় ভোট। সেই ভোটে প্রার্থী হয় স্বয়ং রঘুনাথ। হাতি চিহ্নে। এরপরেই ভূমিদাসদের চেনা-বোঝা পরিবেশ পাল্টে যায়। নাগরা দিয়ে, পালোয়ান দিয়ে পেটানো, ঘরে আগুন লাগিয়ে দেওয়া রঘুনাথ সিং তাদের ডেকে লাড্ডু খাওয়ান, বালিতে বুজে আসা কুয়ো কাটিয়ে দেন, দোসাদ ঘরে বিয়ের পাকা কথায় কাজ থেকে ছুটি দেন। একমাত্র প্রাজ্ঞ গণেরি বোঝে এ সবই আসলে ভোটের অঙ্ক। সংখ্যার হিসেব। "অচ্ছুৎ" ভোট না পেলে শুধু উচ্চবর্ণীয় ভোট রঘুনাথের ভোটের তরি পার লাগাতে পারবে না। উপন্যাসে দোসাদদের পরাধীন জীবনসংগ্রামকে লেখক মিলিয়ে দিয়েছেন আশেপাশের আদিবাসী জীবনের খিদের সংগ্রামের সঙ্গে। সারাবছর ক্ষেতে ভূমিদাসরা কাজ করলেও চাষের বিপুল কাজ ও ফসল তোলার কাজ করার জন্য প্রতি বছর আদিবাসী মানুষজন আসে। চাহাড়ের হাটে চলে নির্বাচন। স্রেফ পেটভাতা, সামান্য মজুরি, কিলোখানেক মকাই বা জনাই বা গুমো আতপ চালের বিনিময়ে উদয়স্ত পরিশ্রমের সুলভ ক্ষেতমজুর গরিব আদিবাসীরা ছাড়া কেই বা হতে পারত। হাটে ক্ষেতমজুরের যে নির্বাচন প্রক্রিয়া চলে সেটা যে কোনো গোহাটাকেও হার মানাবে। গা-হাত টিপে দেখে নিতে হয় ক্ষেতের কাজের পরিশ্রমের উপযুক্ত কিনা! সারাবছর খিদের সঙ্গে লড়াই করা মানুষের মধ্যে বেছে নেওয়া হয় শক্ত সমর্থকে। দুর্বলরা বাতিল। আরও কঠিন লড়াই

বাতিলদের জন্য অপেক্ষা করে থাকে। ভূমিদাসদের প্রতি যেমন, এই মরসুমি কিষানদের প্রতিও ঝরে পড়ে উচ্চবর্গীয় ঘৃণা- "রামলছমন ফের বলে, 'কী মালুম হল, জানবরটার গায়ে তাকত আছে?"[২৪] দুর্বল, মরসুমি কাজের অনুপযুক্ত বৃদ্ধ, অসুস্থ মুণ্ডা, ওঁরাওদের একমাত্র ভরসা প্রকৃতি, জঙ্গল। প্রকৃতির সন্তানেরা প্রকৃতির মধ্যেই বেঁচে থাকার রসদ খোঁজে। মহুয়া ও শাকপাতা খোঁজে। ধর্মা দেখে বিভিন্ন দিক থেকে আদিবাসীর দল জঙ্গলে এসে পড়ছে খেয়ে বাঁচার আশায়। খরার সময়ে ক্ষুধার্ত আদিবাসীদের অবস্থা ধর্মার চোখে ধরা পড়ল এইভাবে- "শ দেড় দুই আদিবাসী মুণ্ডা ওঁরাও আর সাঁওতাল বালিতে পা ডুবিয়ে ডুবিয়ে এগিয়ে আসছে। হাড্ডিসার ক্ষুধার্ত চেহারা, চোখ এক আঙুল করে গর্তে ঢুকে গেছে। পরনে ময়লা চিটচিটে টেনি। মেয়েগুলোর বেশিরভাগই কোমরে একটি করে বাচ্চা ঝুলছে। মায়েদের মরুভূমির মতো ধু-ধু নির্জলা বুকের বোঁটায় চোঁ চোঁ করে দু-একটা টান দিয়েই তারা চিৎকার করে উঠছে।"[২৫] উচ্চবর্গীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে ভূমিদাস ও ভূমিহীন এই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে তফাৎ না থাকলেও সূক্ষ্ম তফাৎটুকু থেকেই যায়, খিদের জন্য এই তীব্র সংগ্রাম ভূমিদাসদের মধ্যে নেই, আবার যে অধীনতার চেতনা দোসাদদের সব অপমান ও লাঞ্ছনাকে নিয়তি ভাবতে শিখিয়েছে, আদিবাসীদের মধ্যে তা নেই। বরং, সবসময়ই একধরনের স্বাধীন মনোবৃত্তি তাদের নিয়ন্ত্রণ করেছে। উচ্চবর্গের বিপ্রতীপে নিম্নবর্গের অবস্থানে তারা প্রায় একই সারিতে দাঁড়িয়ে আছে বলে পরস্পরের প্রতি একধরনের সহানুভূতির বোধ কাজ করে। তাই যে মহুয়ার ফল বুভুক্ষু মানুষদের বেঁচে থাকার শেষ আশ্রয়, সেই ফল গাই-চরানিরা পশুদের জন্য তুলে নিলে রঘুনাথের কাছে দরবার জানায় দোসাদরা। রঘুনাথের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অজ্ঞ দোসাদরা মহুয়ার ফল শেষ হয়ে যাচ্ছে দেখে আদিবাসীদের নিয়ে পাহারা দেয়। গাই-চরানিদের সঙ্গে খণ্ড-যুদ্ধে গণেরির মাথা ফাটে। যে ভীরুতা তাদের নিম্নবর্গীয় অধীনতা চেতনাজাত সেই ভীরুতায় তারা পিছু হাঁটে, ভয় পায়; অন্যদিকে

আদিবাসীরা তাদের স্বাধীন চেতনায় পেটে খিদে নিয়েও তারা গর্জে ওঠে- "কিন্তু ডর বস্তুটা তাদের সিনায় নেই। ওদের বেশিরভাগেরই কাঁধে রয়েছে টাঙ্গি বা তীর ধনুক। সেগুলো বাগিয়ে তারা রুখে দাঁড়ায়।"[২৬]

উপন্যাসে আদিবাসী মরসুমি ক্ষেতমজুরের সূত্র ধরে এসেছে আড়কাঠির প্রসঙ্গ। *সংসদ বাংলা অভিধান* "আড়কাঠি"র অর্থ বলছে "খনি কারখানা প্রভৃতির জন্য  মজুর সংগ্রহকারী।"[২৭] অবশ্য এই সংগ্রহ সবসময় সঠিক পথে ঘটে না। আড়কাঠিদের সহজ টার্গেট হয় গরিব আদিবাসীরা। আদিবাসীদের খাদ্যের সংস্থান সম্পর্কে নিরুত্তাপ রাষ্ট্রের আদিবাসীরা খাদ্যের খোঁজে আড়কাঠি মারফৎ চালান হয়ে যায় আসামের কোনো চা-বাগানে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের *বীতংস* গল্পে আড়কাঠি সুন্দরলাল ছলনার আশ্রয় নিয়ে সহজ সরল সাঁওতালদের চালান করে দেয় আসামের চা-বাগানে কুলি হিসেবে। সিঙ বোঙার ভরের নিপুণ অভিনয়ের দক্ষতায় সে সাঁওতালদের বোঝাতে সক্ষম হয় যে করম দেবতার রাগে তাদের গ্রামে "হায়জা" বা  মড়ক লাগবে। মড়কের হাত থেকে পথ বাতলে দেয় সে নিজেই। দল বেঁধে পুরো সাঁওতাল গ্রাম চলে সুন্দরলালের সঙ্গে আসামের চা- বাগানে অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতের দিকে। চাহঢ়ার হাটে ধর্মা দেখে দু'জন আড়কাঠি ক্ষেতমজুর হিসেবে জমি মালিকদের তরফ থেকে নির্বাচনের জন্য আগত আদিবাসীদের দারিদ্র্যহীন জীবনের কথা শোনায়, যা তাদের কাছে অনেকটা রূপকথার গল্পের মতো। পেটে খাবার, পরনের বস্ত্রের সামান্য চাহিদা পূরণের গল্প স্বাধীন ভারতেও আদিবাসীদের কাছে রূপকথার কাহিনির মতো শোনায়, রূপকথার মতো এইকারণেও যে, যারা ন্যূনতম চাহিদা পূরণের স্বপ্ন চোখে নিয়ে রওনা দিয়েছিল সমতল থেকে, ছোটোনাগপুর এলাকার রুক্ষ মাটি থেকে সুদূর আসাম বা ত্রিপুরার চা-বাগানে বা ইঁটখোলায়- তারা কেউ ফেরেনি। বাস্তবের রূঢ় ছবি তাদের কাছে রহস্যে ও খানিক সন্দেহে ঢাকা। ভগীরথ মিশ্রের *আড়কাঠি* উপন্যাসে আড়কাঠি

রঙলাল গজাশিমুলের বসুশবর মানুষদের বোঝায় তাদের আসামে চলে যাওয়া আত্মীয়রা সুখে আছে। তাদের পাঠানো চিঠি সে পড়ে শোনায়, মাদলে উৎসবে নেচে ওঠা অস্পষ্ট ছবি দেখায়। গজাশিমুলের লোকের মনেও প্রশ্ন ওঠে অশিক্ষিত তাদের স্বজন চিঠি লিখল কী করে। কিন্তু রূপকথার দেশে তো সবই সম্ভব। কোম্পানির মাস্টারের কাছে পড়াশোনা করে চিঠি লেখাও? সস্তার মজুরের আশায় ভুল বুঝিয়ে যে কোম্পানির আড়কাঠিরা সমতল থেকে আদিবাসী মজুর নিয়ে যায় পড়াশোনা শেখানো যে সেখানে অবিবেচক ও বিপদের কাজ- মালিক পক্ষের মতো পাঠকও বোঝে। বোঝে রঙলাল মিথ্যে বলছে। শুধু বিশ্বাস করে গজাশিমুলের সেই আত্মীয়বিচ্ছিন্ন মানুষগুলো, কিংবা বিশ্বাস করে না, কিংবা বিশ্বাস করা ছাড়া আর কোনো পথ তাদের কাছে খোলা নেই। *বীতংস* গল্পে বুধনীকে হিসেবের বাইরে রেখেছিল আড়কাঠি সুন্দরলাল, ছিল অন্য হিসেব। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারী, সে যে কোনো জাতি, শ্রেণি, ধর্মের হোক না কেন, সে নিম্নবর্গীয়, দলিত। নারী শোষণের একটা দিক যৌন শোষণ। বুধনীর হিসেবটা সুন্দরলাল কোন জায়গায় যোগ করেছে লেখক ইঙ্গিতে তা গল্পের মধ্যে স্পষ্ট করেছেন। *আড়কাঠিতে* দেখা যায় রঙলালের স্বরূপ ধরা পড়ে গেছে। গজাশিমুলের মানুষ জানতে পেরেছে তাদের মেয়েদের বেচে দেওয়া হয়েছে দূরের কোনো হাটে। আকাশের নীচে মানুষ নওরঙী দোসাদ, উচ্চবর্ণীয়ের কাছে ‘‘অচ্ছুৎ’’ অথচ ভোগ্য। হিমগিরির ‘‘রক্ষিতা’’ হয়ে উচ্চবর্ণের কাছে থাকা নওরঙ্গী দোসাদদের বিরুদ্ধে কাজ করে, চর হয়ে ধরিয়ে দেয় ভূমিদাসের জীবন থেকে পালানো গণাকে। উচ্চবর্ণের হাতে যৌন শোষণের স্বরূপ বুঝতে অক্ষম নওরঙীকে নিজেদের কাজে লাগায় শোষক। নিম্নবর্ণীয় নারীর ওপর যৌন শোষণের উদাহরণ উপন্যাসে পাওয়া যায় রামলছমনের সঙ্গে গিধনির কথোপকথনে, ভোটের পারস্পরিক বোঝাপড়ায় রঘুনাথের মিশিরলালজির লালসা চরিতার্থ করতে তার কাছে গিধনি, কুশী, সোমবারী, তিসিদের পাঠিয়ে দেওয়ায়, ঔপন্যাসিকের নিজস্ব বয়ানে–

"উচ্চবর্ণের লোকেরা, বিশেষ করে মালিক বড়ে সরকার এবং হিমগিরি বা রামলছমনের মতো তাঁর প্রবল দাপটওলা নৌকরেরা পুরুষানুক্রমে খরিদী কিষাণদের ঘরের যুবতী মেয়েদের ভোগদখল করে আসছে। সূর্যোদয় সূর্যাস্তের মতো এটা স্বাভাবিক স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার।"[২৮] ধর্মা তার আর কুশীর মুক্তির জীবনের জন্য চিতার বাচ্চা ধরে আনতে পারে মা চিতার সঙ্গে লড়াই করে, সেই চিতার বাচ্চা বিক্রির টাকায় কিনতে চায় নিজেদের মুক্তি, কিন্তু পারে না। রঘুনাথের মুন্‌শি আজীবচাঁদের হিসেবের খাতায় তো সেই মুক্তির পথ লেখা থাকে না, তাই দু'হাজার টাকার কর্জ পাঁচ হাজার হয়ে যায়। চিতার সঙ্গে লড়াই করা যায়, শুধু তারা লড়তে পারে না রঘুনাথদের বিরুদ্ধে, এর কারণ অবশ্য তাদের নিয়তিবাদে বিশ্বাস ও শিক্ষার অভাব। শেষে ঔপন্যাসিক ধর্মার রঘুনাথকে অস্বীকারের মধ্যে সেই নিপীড়িত হওয়ার প্রবহমান বিশ্বাসে ও অধীনতার মানসিকতায় আঘাত করলেন।

উপন্যাসে আদিবাসী গোষ্ঠীর কথা রয়েছে, তাদের সাধারণ জীবন সংগ্রাম, খিদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কথা আছে। ব্যক্তিবিশেষের তেমন কথা নেই, একমাত্র মুণ্ডা যুবক রুখিয়া ছাড়া। সারা শরীরে দুর্ভিক্ষের ছাপ নিয়ে সে জঙ্গলে খাবারের সন্ধানে এসেছে দশ মাইল দূর থেকে। নিপুণ তিরন্দাজিতে সে শিকার করে দুটো খরগোশ। ক্ষুধার্ত সন্তান থাকা সত্ত্বেও সে শিকারের একটা খরগোশ অবলীলায় দিয়ে দিতে পারে ধর্মাকে। উপন্যাসে আদিবাসী জীবনের স্বল্প পরিসরে ঔপন্যাসিক আদিবাসীদের জীবন সংগ্রাম, স্বাধীন চেতনা, সাহস ও উদারতা দেখালেন নিপুণ দক্ষতায়।

*কোজাগর* (১৯৮৪) উপন্যাসে ঔপন্যাসিক বুদ্ধদেব গুহ নিপুণ দক্ষতায় পালামৌ জঙ্গলকেন্দ্রিক আবর্তিত হওয়া মানুষদের জীবন ও সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষদের নিম্নবর্গ বা প্রান্তিক মানুষদের প্রতি মানসিকতার পরিচয় তুলে আনলেন। "কোজাগর" বা "কে জাগে?"- এই প্রশ্ন দিয়ে উপন্যাসের

পরিসমাপ্তি। উপন্যাসের শেষের তিনটি লাইনের প্রথমটিতে বিবৃতি বা কথকের উপলব্ধি- "জাগে না কেউই। এ দুঃখরাতে, এ দেশে; এ যুগে।"[২৯] অবশ্য এ উপলব্ধিই চরম সত্য নয় বলে সংশয় জাগে, আর সেই সংশয় থেকে পৌঁছে যান বিপরীত অনুভবে, যেখানে জাগার পরিক্রমা শুরু হয়েছে বলে আশা থাকে- "না কি? কেউ জাগে?" "কে জাগে?"[৩০] শোষণ, বঞ্চনা ও সন্তান হারানোর বেদনার পরেও আসলে জেগে থাকে জীবন কিংবা নান্‌কু কিংবা সেই অভ্যস্ত জীবন- যে জীবনে মানিয়া-মুঞ্জ্‌রীরা নান্‌কুর সমস্ত চেষ্টা সত্ত্বেও নিম্নবর্গীয় ভীত, সন্ত্রস্ত, অধীন চেতনায় সাহস জোটাতে পারেনি। নিজেকে মুক্ত করার সাহস, সম্মানিত করার স্পর্ধা দেখাতে পারে না বলেই শেষ পর্যন্ত সম্মানহীন জীবনে ফিরতে হয়- "মানুষ যদি নিজের মাথা নিজে না উঁচু করে, সম্মানিত না করে নিজেকে ; তবে অন্য কেউ তাকে উন্নতমস্তক, সম্মানিত করতে পারে না। যার যার মুক্তি তার তার বুকের মধ্যেই বয়ে বেড়ায় মানুষ। সেই প্রচণ্ড শক্তিকে সে নিজে যত দিন না মুক্ত করছে, ততদিন কারোরই সাধ্য নেই তাকে মুক্ত করে।"[৩১] সমগ্র উপন্যাসজুড়ে বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে দিয়ে ঔপন্যাসিক আসলে এই সারসত্যটিই তুলে ধরতে চেয়েছেন।

এই উপন্যাস ভালুমারের মানিয়া-মুঞ্জ্‌রী, পরেশনাথ-বুল্‌কি, হীরু-টুসি-নান্‌কুর জীবনের কাহিনি। নিম্নবর্গের বা প্রান্তীয় মানুষদের জীবনের সব কাহিনিই আসলে প্রত্যাখ্যানের বা বিযুক্তির কাহিনি। খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান-স্বাস্থ্য–শিক্ষার অধিকার থেকে বিযুক্তির সঙ্গে সঙ্গে সত্তার বিকাশের প্রত্যাখান তাদের চেতনাকেও গ্রাস করে। দীর্ঘদিনের এই বিযুক্তি তাদের ভীত করে রাখে, অন্যায় ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে নীরব থাকতে শেখায়। তাদের সেই ভীত, অধীন, নিস্ক্রিয় সত্তার জাগরণ কামনা করে নান্‌কু। চেতনায় আঘাত করতে চায়, আঘাতে আঘাতে জাগিয়ে তুলতে চায়- "হঠাৎ মনে হল, নান্‌কু বোধহয় ঠিকই বলে। ওরা যে অত্যাচারিত হয়েছে এবং বঞ্চিত হয়ে এসেছে যুগ যুগ ধরে, এর পেছনে

ওদেরও একটা নিশ্চিত নেতিবাচক ভূমিকা আছে। ওরা নিজেদের আসন সম্বন্ধে এখনও একেবারেই সচেতন নয়।"[৩২] উপন্যাসে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যে সংসারের কঠিন লড়াই দেখিয়েছেন লেখক, তা হল মানিয়া-মুঞ্জ্রীর। মানিয়ার দারিদ্র্যের লড়াইটা একটামাত্র ঘটনায় লেখক উপন্যাসের প্রথমাংশেই বুঝিয়ে দিয়েছেন, চীনেবাদামের ক্ষেত খরগোশের হাত থেকে বাঁচাতে গিয়ে পড়ে যাওয়া মানিয়ার হাত থেকে ছিটকে যায় লন্ঠন, গড়াতে থাকে কেরোসিনের তেল। সে কোনোভাবে তুলে নেয় লন্ঠন, দারিদ্র্যে জর্জরিত মানিয়া ভাবে- "কেরোসিন তেল গড়ানোর চেয়ে ওর বুকের রক্ত গড়ানোও যে ভালো।"[৩৩] অথচ মানিয়া-মুঞ্জ্রীরও একটা ভালোবাসার জগৎ ছিল, যেখানে যুবতি মুঞ্জ্রীকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে শীতের দীর্ঘরাত কাটিয়ে দিয়েছে মানিয়া। অথচ এখন মুঞ্জ্রীর কাছে রুক্ষতা ছাড়া আর কিছুই সে পায় না। দারিদ্র্যের সঙ্গে অসম লড়াইয়ে মানিয়ারা পেরে ওঠে না, খিদের সংসারে দ্রুত বুড়ো হয়ে যায় বা বুড়ো হতে চায়। সাত বছরের ছেলে পরেশনাথের ধুলোমাখা শরীরের গন্ধ নাকে ভরে স্বপ্ন দেখে- দেখতে দেখতে সে জোয়ান হয়ে উঠবে, সংসারের দায়িত্ব নেবে আর মানি ওঁরা তার বংশধরের হাতে সবকিছু ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে বিশ্রাম নেবে– "মাদল বাজাবে, বড় জোর বজ্‌রা ক্ষেতে রাতের বেলায় মাচায় বসে শুয়োর হরিণ তাড়াবে, নয়তো দিনের বেলা সুগা তাড়াবে, মকাইয়ের ক্ষেতে সবাই ঘাসের বানাবে আর সারাদিন রোদে বসে থাকবে। বস্তির বুড়োরা যেমন থাকে!"[৩৪] ভরা দারিদ্র্যের সংসারে পাঁচ টাকা যে পচাই বা মদ খেয়ে ওড়াতে নেই সে বোধটুকু মানিয়ার নেই, বরং আজন্মের কষ্টের জীবনে ক'ঘণ্টা খুশি পেতে চায়। মানিয়া দুর্বল। বড়ো মেয়ে জীরুয়ার ওপর গোদা শেঠের অমানুষিক যৌননির্যাতন ও মৃত্যুর শোক মানি ওঁরাওকে দুর্বল করে দিয়েছিল, নান্‌কুর শত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সে বুকে সাহস জাগেনি, আত্মসম্মান জাগেনি। ন'বছরের নিরপরাধ ছেলেকে চোর অপবাদ ও নিষ্করুণ মারের হাত থেকে সে বাঁচাতে পারেনি, ভরা হাটে স্ত্রীর সম্মান রক্ষা করতে

পারেনি। যে মাহাতোর হাতে এত নিগৃহীত, নিপীড়িত হয়েছে সেই মাহাতোর সঙ্গে স্ত্রী মুঞ্জ্রী যখন রাত কাটিয়ে আসে তখন তাকে আটকাতে পারেনি, মুঞ্জ্রীর মাহাতো স্ত্রী হবার সিদ্ধান্তে বাধা দিতে পারেনি। যে ছেলেকে বার্ধক্যের শেষ অবলম্বন ভেবেছিল, সেও যখন মাহাতোকেই বাবা বলে স্বীকার করে মানিয়াকে অস্বীকার করতে চাইল তখনও আসলে মানিয়ার কিছু করার ছিল না। ব্যর্থ পিতৃত্বের অসহায় বেদনার প্রকাশ ঘটে উপন্যাসে এভাবে- "মানির নাকে পরেশনাথের গায়ের গন্ধটা হঠাৎ ফিরে এল। শীতের রাতে, লেপ কম্বলের অভাব মেটাবার জন্যে গরিব বাপ যখন তার শিশুছেলেকে বুকের মধ্যে আশ্লেষে জড়িয়ে ধরে একটু উষ্ণতা দেবার এবং পাবারও করুণ চেষ্টা করত সেই সময়কার ওম-এর গন্ধের কথাও। যা কিছু জাগতিক, ও দিতে পারেনি তার আদরের ব্যাটা পরেশনাথকে; লাল-জামা, ভালোমন্দ খাওয়া জুত, দশেরার মেলায় বুড়ির চুল কিনে খাওয়ার পয়সা অথবা নাগরদোলায় চড়ার, তার সব কিছু অপূর্ণতাই ঘুমন্ত পরেশনাথকে বুকে জড়িয়ে ধরে মানি পূরণ করতে চাইত।"[৩৫] মানিয়াকে কখনও কখনও স্বার্থপর পিতা বলে মনে হয়েছে, যে সন্তানের দায়িত্ব নিতে অপারক অথচ সন্তানের ওপর নিজের ভবিষ্যতের দায়িত্ব দেওয়ার স্বপ্নে মশগুল থাকে। মুঞ্জ্রী পরেশনাথকে স্কুলে না পাঠাতে পারার জন্য দুঃখ পেয়েছে, তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কামনা করেছে, কিন্তু শুধু শারীরিক নয়, মানসিক দিক দিয়েও দুর্বল মানির ভাবনায় এমন উজ্জ্বল চিন্তা দানা বাঁধে না। মানির জীবনে সবচেয়ে বড়ো আঘাত আসে মুঞ্জ্রী নয়, পরেশনাথের দিক থেকে। মেয়ে বুল্‌কি তাকে ছেড়ে যাবে না, কিন্তু মায়ের হাত ধরে চলে যাবে তার পরেশনাথ, যাকে কেন্দ্র করে তার পিতৃত্ব মূলত আবর্তিত। মুঞ্জ্রীর কাছে চিরকালই মানি "...মানুষটা সৎ, অত্যন্ত ভালো, চাহিদাহীন এবং পুরোপুরি পরনির্ভর।"[৩৬] মেরুদণ্ডহীন মানির পৌরুষ, সাহসকে সে আঘাতে আঘাতে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছিল, মানির মুঞ্জ্রীর ওপর নির্ভরশীলতাকে, মানির প্রতি তার সহানুভূতিকেই ভালোবাসা জেনে

এসেছিল। অথচ খিদেহীন জীবন তারও কাম্য ছিল। তাই এক জটিল মনস্তত্ত্বে তাকে খোলা বাজারে অসম্মানিত করা মাহাতোর গৃহিণী হবার প্রস্তাব সে স্বীকার করে নিয়েছে। আসলে মুঞ্জ্‌রীদের জীবনে খিদেটা সবচেয়ে বড়ো সত্যি। জীবনের অভাববোধ থেকে পরেশনাথও মাহাতোকে বাবা বলে স্বীকার করে নেয়। কান্দাগেঁঠি খুঁড়ে, শুখামহুয়া খাওয়া বিপন্ন ও খিদেতে জীর্ণ শৈশব ঘিয়ে ভাজা পুরি, মিষ্টির কাছে অবনত হয়, পেটভর্তি খাবারের আশ্বাস যে পিতা দিতে পারে না, তাকে পর্যন্ত অস্বীকার করতে চায়- "বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো বুঝতে পারলাম হঠাৎ, বড়ো বেদনার সঙ্গে যে, আমি, এমন কী ওর জন্মদাতা মানিও ওর কেউ নয়। ওদের আমরা কেউই নই। যে ওদের দুবেলা পেট ভরে খেতে দেবে, সেইই ওদের সব। সে খাবার যত নোংরা হাত থেকেই আসুক না কেন? যত অসম্মানের সঙ্গেই তা দেওয়া হোক না কেন। পেটে এই গ্রীষ্ম শেষের দাবদাহের কতো খিদে থাকলে, বিদ্যা, শিক্ষা, বিবেক, ন্যায়-অন্যায়, এসবই বাহ্য, ফালতু, বইয়ে-পড়া রাজনীতির পুঁথিগত তত্ত্বে-ভরা ধূলির মতোই ফাঁকা, ন্যাড়া, অন্তঃসারশূন্য। ওদের মুক্তি নেই। আমাদের মুক্তি নেই।"[৩৭] পরেশনাথের বয়স মানির অক্ষমতাকে বুঝেছে, তার পেছনে তার অসহায়তাকে বুঝতে সক্ষম হয়নি। কিন্তু বুল্‌কি বুঝেছে, আর বুঝেছে বলেই তার ন্যায়-অন্যায় বোধে, পরিবর্তিত হওয়া আচরণে, জেগে ওঠা ব্যক্তিত্বে ভয় লেগেছে মুঞ্জ্‌রীর। আর ভয় লেগেছে নান্‌কুর উপস্থিতির আভাসমাত্রে। প্রান্তিক মানুষগুলোকে শোষণ, বঞ্চনা থেকে উদ্ধারে দৃঢ় সংকল্প নান্‌কু তার মানুষ অস্তিত্বের অতিরেকে ন্যায়, বিচার, ধর্ম ও প্রতিবাদের প্রতীক হয়ে উঠেছে। তাই যে নান্‌কুকে মুঞ্জ্‌রী ভালোবাসত, স্নেহ করত, শ্রদ্ধা করত সেই নান্‌কুকে শোনচিতোয়ার চেয়েও বেশি ভয় পায় মুঞ্জ্‌রী, কারণ প্রতিবাদের পথ এড়িয়ে, শ্রেণিশোষণ থেকে মুক্তির জাগরণকে উপেক্ষা করে মুঞ্জ্‌রী নিজের সাময়িক ভালো থাকার জন্য শোষক মাহাতোর হাত ধরতে চলেছে, এতে সামগ্রিক শ্রেণিজাগরণের নান্‌কুর প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাবে, পরেশনাথের সামনে

অত্যাচারী মাহাতোকে শাস্তি দিয়ে নান্‌কু আশা করেছিল পরেশনাথের মতো ভবিষ্যতের যুবকদের সে এই লড়াইয়ে পাশে পাবে, আর একদিন এই লড়াইয়ে এই সংখ্যাগরিষ্ঠ শোষিত মানুষ, বঞ্চিত মানুষদের জয় হবে। তবে যে চেতনায় অধীনতা, ভীরুতা ঘর বেঁধে আছে, সেই সুপ্ত সত্তা যেদিন তার শক্তিকে অনুভব করবে, সেদিনই এই লড়াই জেতা একমাত্র সম্ভব। তাই পরেশনাথদের কাছে সাহসের দৃষ্টান্ত গড়ে তুলতে চেয়েছিল। চেয়েছিল– "নান্‌কুয়া এও জানে যে, আজকের ছোট্ট-মুঠির, হালকা-শরীরের শিশুরা একদিন যুবক হবে। মানিয়ার মতো কাপুরুষ, ভীরু পরিবেশের ভারে ন্যুব্জ জীব হবে না তারা। তারা মরদ হবে সত্যিকারের। এই সমস্ত গরিব-গুর্‌বো মানুষগুলোর ভবিষ্যৎ তখন ওদের শক্ত মুঠিতে ধরা থাকবে। সে ভবিষ্যৎ নাড়ানোর ক্ষমতা মাহাতোদের, গোদা শেঠদের আর কখনওই হবে না।"[৩৮] নান্‌কু এক কাঙ্ক্ষিত আদর্শ সময়ের কথা বলে, অথচ সেই সময়ের জন্য যে চেতনার প্রয়োজন তা এই শোষিত মানুষগুলোর নেই। যে পরেশনাথের ওপর নান্‌কু ভরসা করেছিল, অভাব তা রক্ষা করতে দেয়নি। দুর্ঘটনা পরেশনাথের জীবন কেড়ে নিয়েছে, না নিলে নান্‌কুর গড়ে তোলা লড়াইয়ের উত্তরাধিকার সে হতে পারত কিনা বলা সম্ভব নয়। সময় সে কথা বলত। কিন্তু পরেশনাথ ও বুল্‌কির মৃত্যু মানি ওঁরাও ও তার স্ত্রী মুঞ্জ্‌রীকে আবার একসঙ্গে থাকার কারণ দিয়েছে, সেই কারণ সন্তানশোক।

উপন্যাসে নান্‌কু হয়ে উঠেছে শ্রেণিআন্দোলনের প্রতীক। সে বিশ্বাস করে, শোষিত, বঞ্চিত অত্যাচারিত মানুষদের জাগরণের মধ্যে দিয়ে সমাজে শোষণের অবসান ঘটবে। সমাজের ক্ষমতা উঠে আসবে এই সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষদের হাতে। নান্‌কু ওঁরাও নিজেও গোঠা শেঠ ও মাহাতোদের অত্যাচারের শিকার। তাদের কারণেই কৈশোরেই অনাথ হতে হয়েছিল নান্‌কুকে। বসন্ত রোগের কারণে নান্‌কুর বাবা টিগা বিনা চিকিৎসায় মারা গেলে মা রসিয়া কোনোভাবে শিশু নান্‌কুকে নিয়ে দিনপাত করত। সুন্দরী

রসিয়াকে ভোগ করে আধুলি বা টাকাটা দিলে শেঠের দোকান থেকে শুখা মহুয়া বা বাজরা এনে মুখে তুলে দিত সন্তানের। এমন ভোগের কারণে সন্তান-সম্ভবা রসিয়াকে কোজাগরী পূর্ণিমায় গোদা শেঠের দাদা জোদা শেঠ বন্ধু-বান্ধব মিলে ফরেস্ট বাংলোয় তুলে নিয়ে দিয়ে ধর্ষণ করে, সেই অত্যাচারের ফলে রক্তপাত হয়ে মারা যায় রসিয়া। কয়লাখাদে কাজ করে নান্‌কু। উপার্জন করে মোটামুটি ভালোই। উপার্জনের টাকায় নিজের মতো করে জীবনটা সে কাটিয়ে দিতেই পারত। কিন্তু সে অন্য ধাঁচে তৈরি। তাই মুঞ্জ্‌রীদের জন্য মাঝেমধ্যেই খাবার নিয়ে আসে, তাদের জন্য শত্রুতা তৈরি করে গোদা শেঠ, মাহাতোর সঙ্গে, এই শত্রুতা তার প্রাণসংশয় ঘটাতে পারে জেনেও। দীর্ঘদিন ধরে মাহাতো ও গোদা শেঠেরা যে অত্যাচার করে এসেছে তার বিরুদ্ধে একত্রিত হবার শক্তিকে সে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করে, এই প্রচেষ্টা গোদা শেঠেদের ক্ষমতার মৃত্যু ঘটাতে পারে বলেই নান্‌কু টার্গেট হয়ে যায়, কিন্তু কাড়ুয়া বোঝে নান্‌কু আর কোনো মানুষের নাম নয়, সে হয়ে উঠেছে সব অত্যাচার, শোষণের প্রতিবাদের প্রতীকস্বরূপ। প্রান্তিক মানুষগুলো, অত্যাচারিত মানুষগুলোর মধ্যে প্রতিটা জাগ্রত সত্তার নাম নান্‌কু- "নান্‌কুকে মেরে ফেললেই নান্‌কু মরবে না। নান্‌কু কোনো একটা লোক নয়। নান্‌কুর রক্ত ঝরালে সেই রক্তের বীজ থেকে এমন অনেক লোক লাফিয়ে উঠবে। একসময় নান্‌কুয়া একা ছিল। আজ আর নেই।"[৩৯] শ্রেণিসংগ্রামের নেতা হয়ে ওঠে সে। হাটে মুঞ্জ্‌রীকে বিবস্ত্র করে মাহাতো ও অনুচরেরা যখন যৌন নির্যাতন করতে উদ্যত তখনও হাটের অন্যান্য মানুষেরা মাহাতোর ভয়ে মুঞ্জ্‌রীকে বাঁচানোর চেষ্টা করলো না, একমাত্র সায়ন মুখার্জী বা কথক ছাড়া। কথকের সাহসে ভর করে হাটের মানুষজন একটু একটু করে এগিয়ে আসছিল ঠিকই, কিন্তু পরিপূর্ণ প্রতিবাদের সাহস তারা জোটাতে পারেনি। এমন সময় নান্‌কুর আবির্ভাবের আভাস মাহাতোদের এতদিনের হিসেব এলোমেলো করে দেয়। অত্যাচারিত মানুষগুলো মাহাতোদের মারের মুখের ওপর

নিজেদের মধ্যেকার শক্তিকে পুঞ্জিভূত করে পাল্টা মার দিল। কথক বলছেন- "জনতা যে মরা ব্যাঙের মতো ঠাণ্ডা অথচ ডিনামাইটের মতোই শক্তিধর সেই কথা প্রথম উপলব্ধি করলাম আমি সেদিন। শুধু ডিটোনেটর চাই।"[৪০] নিজের শক্তি সম্পর্কে অসচেতন মানুষদের মধ্যেকার শক্তিকে এভাবে জাগিয়ে তোলাই ছিল নান্‌কুর প্রধান লক্ষ্য- "মানুষের মনের জোর আবার যেদিন মানুষ পুনরাবিষ্কার করবে সেদিন বোধ হয় অল্পকটা খারাপ লোক, অগণ্য ভালো লোকের ওপর খবরদারি করতে পারবে না।"[৪১] এই জোর তারা পেয়েছে জেনে নান্‌কু চলে যায়, তবু নান্‌কু যেহেতু একটা আদর্শ, একটা প্রতীক, তাই চলে গিয়েও সে থেকে যায় অন্যায়কারীর বুকে ভয়ের মতো। অধর্মের বিনাশের জন্য ধর্মের মতো।

নান্‌কু যখন শোষণের হাত থেকে শ্রেণির মুক্তির পথে লড়াই করছে, হীরু ওঁরাও তখন সেই শ্রেণিকেই, নিজের শিকড়কেই অস্বীকার করতে চেয়েছিল। ''ওঁরাও'' শব্দের সঙ্গে যে উপজাতীয় গন্ধ আছে তাকে পরিচয় থেকে মুছে ফেলতে এফিডেভিট করে হীরু ওঁরাও থেকে হয়ে যায় হীরু সিং। গ্রামে এসেও দরিদ্র পিতার ঘরে সে ওঠেনি, বড়োলোক উচ্চবর্ণের বন্ধুর সঙ্গে ওঠে ফরেস্ট বাংলোয়। টিহুলের হাতে খামে করে বাবা জুগ্‌নু ওঁরাও-এর কাছে পৌঁছে দিয়েছে দুশো টাকা। দিনের আলোয় নয়, বাড়ির লোকের সঙ্গে দেখা করে যাবে রাতের অন্ধকারে এস. পি. হীরু ওঁরাও। ভারতীয় সমাজে ও মানসিকতায় বহু দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে থাকা বর্ণব্যবস্থা, নিম্নবর্ণ ও আদিবাসীদের প্রতি ঘৃণাকে অর্থ এবং তার পদমর্যাদা দিয়েও দূর করতে পারেনি। যে পরিচয়কে সে গোপন করেছিল, সেই পরিচয়টাই যে বাকিদের কাছে সবচেয়ে বড়ো সত্যি একথা সে পরবর্তীকালে উপলব্ধি করে। বোন টুসিকে বন্দুক দেখিয়ে ধর্ষণ করার ঘটনা জানতে পেরে হীরুর মধ্যে ওঁরাও সত্তা জেগে ওঠে, বোঝে অর্থ আর সাহেবিয়ানা দিয়ে সে ভালুমারের বস্তির ছেলে হীরুকে অস্বীকার করতে চেয়েছিল ঠিকই, কিন্তু সব

সংস্কার ও হীরুত্বকে একেবারে মুছে ফেলতে পারেনি- "সামনে একটা বড় কৃষ্ণচূড়া গাছ। তার শিকড় নেমে ছড়িয়ে গেছে এদিক ওদিক। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে আর বাবার হাতটার কথা হঠাৎই মনে পড়ল হীরুর। কঠোর-পরিশ্রমী, দীন-দুঃখী, তার জন্যে-গর্বিত, তার বাবার হাতের শিরাগুলো এই গাছের শিকড়েরই মতো ফুলে ফুলে উঠেছে। হঠাৎই কে যেন ওর বুকে আমূল কোনো তীক্ষ্ণ ছোরা বসিয়ে দিল। বাবা! মা! টুসিয়া। লগন। ওর মস্তিস্কের মধ্যে দ্রুতপক্ষ পরিযায়ী পাখির মতো অনেক বোধ ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে ফিরে আসতে লাগল। ওর মনে হল ভালুমারের হীরু নামক একটি ছেলের প্রাণের শিকড় ছড়িয়ে অনেকই গভীরে প্রোথিত হয়ে আছে। হয়তো প্রস্তরীভূতও হয়ে আছে। ওর বোধহয় সাধ্য নেই যে, সেই শিকড়কে...ও...।"[৪২] শিকড়কে অস্বীকার করতে পারে না বলেই ধর্ষণকারী বন্ধুকে হত্যা করে, হত্যা করে বোন টুসিকেও পুরোনো মূল্যবোধে ফিরে যাওয়া হীরু ওঁরাও। অন্যের সন্তানকে গর্ভে ধারণ করা প্রেমিকা টুসিকে বিয়ে করে নান্‌কু যে উদারতার পরিচয় দিতে পেরেছিল, হীরু বা টুসি তা দিতে পারেনি। আসলে তারা ব্যক্তিগত পরিসর থেকে ভালো-মন্দ বা লাভ-ক্ষতির হিসেব কষেছিল, কিন্তু নান্‌কুর কাছে পুরোটাই আসলে শ্রেণিশোষণ ও তার বিরুদ্ধে লড়াই। টুসিয়া, জগ্‌নুদের শ্রেণি সম্পর্কে অসচেতনতার পরিচয়ও উপন্যাসে পাওয়া যায়। হীরুও একদিন নিজের শ্রেণিকে, পরিচয়কে অস্বীকার করেছিল- "খান্‌দানি, রইস আদ্‌মি কখনও আদিবাসীর বন্ধুর বন্ধু যে হতে চায় না, একথা হীরু এতদিন বুঝেও বোঝে নি। মেনেও মানে নি। অথচ হীরু একটা সময় পর্যন্ত আপ্রাণ চেয়েছিল, ওদেরই একজন হতে, নিজের আপনজনদের ফেলে দিয়ে।"[৪৩] জুগ্‌নুও হীরুর বন্ধুর সঙ্গে টুসির বিয়ে দিয়ে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করবে ভেবেছিল, নান্‌কুর নিখাদ ভালোবাসাকে উপেক্ষা করেছিল টুসিও। ধর্ষণের আগে ধর্ষকের রূপে মুগ্ধ হয়েছিল, এমনকি টুসি সেই ঘটনায় সন্তানসম্ভবা হয়ে পড়লে নান্‌কু সেই সন্তানকে পিতৃপরিচয় দেয়, তবু দ্বিতীয়বার দেখার

মুহূর্তেও টুসির নান্‌কুর প্রতি অকৃতজ্ঞতায় সেই ধর্ষকের প্রতি হৃদয়ের মধ্যে অদৃশ্য ভালোলাগা কাজ করে।

প্রাপ্য মজুরি দেওয়ার বদলে মজুরদের শ্রম লুঠ করতে চাওয়া, মজ্জাগত অস্পৃশ্যতার ধারণায় তিতলির হাতে না খেতে চাওয়া রোশনলালকে তিতলি যখন পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে তখন কথকের মনে হয়- "বেচারি নান্‌কু। কাদের স্বাধীনচেতা, মাথা-উঁচু বুক টান-টান করতে চাইছে? এই হৃদয় আর সংস্কারসর্বস্ব মানুষগুলোর কাছে মস্তিস্কের দাম যে ছিটেফোঁটা নয়। যা তারা চিরদিন করে এসেছে, সয়ে এসেছে, বয়ে এসেছে, তাই-ই তারা করে যাবে।"[৪৪] উল্টোদিকে রথী দা'র মতো লোকও যে এই মানুষগুলোর জন্য গোদা শেঠ, মাহাতো বা হীরুর সেই উচ্চবর্ণের বন্ধুর তুলনায় কোনও অংশে কম ক্ষতিকর নয়, তাও ঔপন্যাসিক স্পষ্ট করলেন। গোদা শেঠ, মাহাতো বা হীরুর বন্ধুর অত্যাচার, শোষণ বা নিম্নবর্গ সম্পর্কে মানসিকতা স্পষ্ট, কিন্তু এই অত্যাচারিত মানুষগুলো যাকে কাছের লোক, আপনার লোক ভেবেছিল, তার মানসিকতাতেও আসলে তাদের জন্য যে ঘৃণাই লালিত, ওপরের বানিয়ে তোলা সহানুভূতি যে নিজের আধিপত্য জাহিরের জন্য, নিজেকে মহান করে নির্মাণের জন্য- উচ্চবর্গের মানসিকতার এই ফাঁকিবাজিটা প্রকাশ হয়ে পড়ে রথী দা চরিত্রে। মুঞ্জ্রীকে অসম্মানের হাত থেকে সে বাঁচানোর চেষ্টা করেনি, নান্‌কুর তাকে চিনতে অস্বীকার করার পরে এতদিনের বানিয়ে তোলা মিথ্যে সুহৃদের মুখোশটা খুলে যেতেই তার আসল নোংরা চেহারাটা স্পষ্ট হয়, থুথু ফেলে সে নান্‌কুর অস্তিত্বে, অবশ্য প্রত্যাঘাতে নান্‌কু সেই ফেলা থুথু তার হাতেই ধরিয়ে দেয়। রথী দা'র এই ঘৃণ্য মানসিকতার পরিচয় প্রথম মেলে কথক বা সায়ন মুখার্জির তারই পরিচারিকা কাহার মেয়ে তিতলিকে বিয়ের সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গে। কথককে চমকে দিয়ে তাকে সমর্থন না করে রথী দা বলেছিল- "এমন সাংঘাতিক ভুল করার আগে ভাল করে ভেবে দ্যাখ্। কুষ্ঠ রোগীদের

জন্যে লেপারস্‌হোম করা বা তাদের জন্যে চাঁদা-তোলা এক ব্যাপার; আর নিজেই কুষ্ঠ-রোগী হয়ে যাওয়া সম্পূর্ণ আর এক ব্যাপার। প্রথমটা গৌরবের। শিক্ষিত এনলাইটেন্‌ড লোকের গর্বময় কাজ। আর, দ্বিতীয়টা, নিজেকে ঘৃণ্য করে তোলার ব্যাপার।"[৪৫] আধুনিক ভারতে জাত-পাত সম্পর্কিত উদারতার ধারণাও যে শুধুমাত্র পুথি বা বক্তৃতাতেই সীমাবদ্ধ, ব্যক্তিগত সংস্কারের সীমা অতিক্রম করে যাপনে অঙ্গীভূত হয়নি, রথী দা'রা তারই প্রতিনিধিত্ব করছে। রাষ্ট্রও এই প্রান্তিক মানুষদের জন্য ভাবে না, তাদের বাঁচাবার কথা ভাবে না। টাইগার প্রোজেক্টের ফলে বেড়ে যাওয়া বাঘ জঙ্গল লাগোয়া বসতি থেকে নিয়ে যায় পোষ্য, বাছুর, মানুষ। সাধারণ বনকর্মীও রেহাই পায় না। বনবিভাগ থেকে খোঁড়া গর্তে বৃষ্টির জল জমে, সেই জমা জলে ডুবে মারা যায় পরেশনাথ-বুল্‌কি। আসলে, এই প্রান্তিক মানুষগুলোর জীবনে খিদে জেগে থাকে, গোদা শেঠ বা মাহাতোরা জেগে থাকে, শোনচিতোয়া জেগে থাকে, জাগে না শুধু সরকার, আর কোনো একদিন জাগার আশা নিয়ে প্রত্যেকের মধ্যে রয়ে যায় নান্‌কু।

*টেরোড্যাকটিল, পূরণ সহায় ও পিরথা* প্রথম প্রকাশিত হয় "শারদীয়া প্রতিক্ষণ"-এ ১৯৮৭-তে। গ্রন্থাকারে ১৯৮৯-এর ডিসেম্বরে। এই উপন্যাস মহাশ্বেতা দেবীর আদিবাসী জীবনকেন্দ্রিক অভিজ্ঞতা ও অনুভবের বেদনাময় প্রকাশ। যে মহাদেশস্বরূপ বিরাট আদিবাসী জগৎকে অনাদিবাসী মূলস্রোতের মানুষেরা আবিষ্কার না করেই ধ্বংস করে ফেলার অপরাধ ঘটিয়েছিল, সেই অপরাধের ক্ষমাপ্রার্থী ঔপন্যাসিক লিখছেন- "কি ওর, কি আমার, কি যে-কোনো অনুরূপ মানুষের (আছেন, তাঁরা আছেন) এ সব প্রচেষ্টার নাম ক্ষমা প্রার্থনা। আমরা নিরন্তর ক্ষমা চেয়ে চলি। এই মানবমানচিত্র থেকে আমরাই (মূলস্রোত-শ্রেণীরা) ওদের প্রাক-বৈদিক কাল থেকে সযত্নে উন্মূল করে চলেছি, সেজন্য কয়েকজন অন্তত ক্ষমাপ্রার্থী থাকুক।"[৪৬] উপন্যাসের পটভূমি মধ্যপ্রদেশের পিরথা নামক ব্লক। বাস্তবিক "পিরথা"

নামক কোনও ব্লক মধ্যপ্রদেশে নেই বলে ঔপন্যাসিক উপন্যাসের ভূমিকা অংশে স্বীকার করে নিয়েও অন্যত্র পরিষ্কার করেছেন, এই "পিরথা" আসলে আদিবাসী পৃথিবী। লিখছেন- "পিরথা ব্লক কল্পনা নয়। কালাহাণ্ডি, বোলাংগির, ছত্তিশগড়ে গলিত গোরুমোষের মাংস খেয়ে আদিবাসীদের মৃত্যু...ইত্যাদি ইত্যাদি তো ঘটমান বর্তমান।"[৪৭] পিরথার ব্লকের জমির জরিপের ম্যাপ দেখলে মনে হবে মেসোজোয়িক যুগের শেষে ভারতবর্ষ যখন মূল গণ্ডোয়ানা ভূমি থেকে আলাদা হয়ে যাচ্ছিল সেই সময়কার ও বর্তমানে বিলুপ্ত কোনো প্রাণী মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। পিরথায় আশি হাজার আদিবাসী মানুষ থাকে যারা মূলত নাগেসিয়া- "নাগেসিয়ারা অস্ট্রো-এশিয়াটিক ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে পড়ে। অনেক জায়গায় তাদের কিসানও বলা হয়, তবে তারা নাগেসিয়া নামেই পরিচিত হতে বেশি পছন্দ করে।...তবে, এক সময়ে তারা মধ্যপ্রদেশের বাসিন্দা ছিল বলে অনেকেই মনে করে। যাই হোক–তারা মূলতঃ কৃষিজীবী সম্প্রদায়, চাষ-আবাদ করেই জীবিকা নির্বাহ করে।"[৪৮] ঔপন্যাসিকের উপরিউক্ত বিভিন্ন স্বীকারোক্তি থেকে অনুমান করে নেওয়া যায় তিনি আদিবাসীদের ওপর হয়ে আসা সুদীর্ঘদিনের বঞ্চনার মহাকাব্যিক আখ্যান নির্মাণে প্রয়াসী হয়েছেন এই উপন্যাসে। এই বঞ্চনার ইতিবৃত্তে বঞ্চিতের স্থানে তিনি যখন রাখলেন নাগেসিয়াদের, উল্টোদিকে বঞ্চনা করছেন যারা সেখানে মূলত বসালেন রাষ্ট্র নামক প্রতিষ্ঠানকে, বিশেষত সেই মূলস্রোতীদের যাদের দ্বারা এই প্রতিষ্ঠান চলে। রাষ্ট্র যখন আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে একরকম ভুলে থাকে, মানসিক সংবাহন ঘটে না, তৈরি হয় শুধুই বিপন্নতা, তখনই টেরোড্যাকটিলের প্রতীকী আবির্ভাব ঘটে- "এই উপন্যাসে আমি ভারতবর্ষে আদিবাসী জনজাতির বিশেষ বিপন্নতার কথা বোঝাতে চেয়েছি। সেজন্যই টেরোড্যাকটিলের মিথিকাল প্রবেশ ও প্রস্থান আমার কাছে দরকার ছিল। কিন্তু পাঠক তো বোঝেন, টেরোড্যাকটিল নেই।"[৪৯]

পৃথিবীর প্রাণের ইতিহাসে মেসোজোয়িক যুগ পেরিয়ে কেনোজোয়িক যুগে প্রবেশের আগের সময়কালের উড়ন্ত সরীসৃপ টেরোড্যাকটিলের অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। সেই বিলুপ্ত প্রাণী টেরোড্যাকটিলের ছায়া পড়েছে চিরদুর্ভিক্ষের পিরথায়। শ্যাম দুসাদ ওরফে সূরজপ্রতাপ এর প্রথম খবরটা করে, সেই খবরের সূত্র ধরে পিরথায় খবর করতে যাওয়া বা বি. ডি. ও. হরিশরণের পূরণ সহায়কে নিয়ে যাওয়া। পূরণ সহায় চরিত্রটি নির্মাণের পেছনে ঔপন্যাসিকের বিশেষ ভাবনা কাজ করেছে। এই উপন্যাস শুধু পিরথা ব্লকের নাগেসিয়া আদিবাসীদের দুর্ভিক্ষপীড়িত অবস্থার কথা বলেই শেষ হয় না, এই অবস্থার কারণ তলিয়ে দেখতে ও দেখাতে চায়, আর সেই কারণ হৃদয়ে অনুভব করে সাংবাদিক আবার স্রেফ সাংবাদিকই নয় এমন চরিত্রের প্রয়োজন ছিল এবং এমন চরিত্র নির্মাণ করতে বামপন্থাকেই আশ্রয় করেছেন ঔপন্যাসিক। বলেছেন পূরণের বাবার কম্যুনিস্ট আদর্শবাদে বিশ্বাস ছিল। ঔপন্যাসিক স্বীকার করে নেন- "এ মতো বাক্য যখন লিখি, তখন আমি অবিভক্ত কম্যুনিস্ট পার্টির কথাই বলি। যার প্রতি কোথাও কোনো আনুগত্য আজও রয়ে গেছে।"[৫০] পূরণ তাই স্বচক্ষে দেখা সত্ত্বেও টেরোড্যাকটিলের কথা, বিখিয়ার ছবির কথা লেখে না, কারণ সে বুঝেছিল এই আবিষ্কারের কথা প্রচারমাত্র বিখিয়াদের অস্তিত্বকে আরও বিপন্নতায় ঠেলে দেওয়া হবে। বরং একজন বিবেকী সাংবাদিকের মতো রাষ্ট্রের নির্লজ্জ উদাসীনতার চিত্রই সে তুলে ধরে। পিরথায় "আকাল" চলে। পিরথার যে জায়গাটায় আদিবাসীরা থাকে তাঁর দক্ষিণে বর্ষায় পিরথা নদী বা নালাতে জল নামে। সেখানে বাঁধ দিলে সারা বছর জল পেত আদিবাসীরা। সবুজ হয়ে উঠত এলাকা। ১১ বছর আগে স্বাধীনতা দিবসে এই প্রকল্পের উদ্বোধনে এসেছিলেন মন্ত্রীরাও। কিন্তু প্রতিবারই মাধোপুরা আর ভূপালের মধ্যে এই প্রকল্পের ফাইল হারিয়ে যায়। ভরা বর্ষায় সরকারি বিশেষজ্ঞ দল পিরথায় গিয়ে দেখে পিরথা নালায় টইটুম্বুর জল, জলহীন এলাকা জল সারপ্লাস বলে ঘোষিত হয়ে যায়। ফলে বছর

বছর অজন্মায় পিরথায় অনাহার চলে। জলের অভাবে পাথুরে জমিতে কেদো চাষও করতে পারে না তারা। ফলে কন্দমূল বা খাজড়া গাছের নরম অংশ খেয়ে কোনোভাবে বাঁচে বা বাঁচে না। আদিবাসীদের এই অবস্থা কোনো ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থায় নয়, স্বাধীন ভারতে। স্বাধীন ভারতেও তারা পেয়েছে শুধু ঔদাসীন্য, বঞ্চনা বা শোষণ। ঔপন্যাসিক লেখেন– "এরা একেবারে নির্বাসিত। আধুনিক ভারতের কাছে পায়নি কিছু। ওই মেটাল রোড ওদের কাছে আসে ঋণের কারণে যে শস্য কেড়ে নেবে, ভালপুরা ও রাজৌরার সেই মহাজনদের, অনশনক্লিষ্ট বাপ মা চূড়ান্ত হতাশায় ছেলে মেয়ে বেচবে সেই মরা পশু খাবার লগ্নের জন্য অপেক্ষামান শকুনদের মতো ধৈর্যশীল খরিদ্দারদের 'রোজ দশ টাকা পাবে আর ভরপেট খাবার' বলে লোভ দেখিয়ে যারা দাস-মজুর করবে আদিবাসীদের, সেই লেবার-ঠিকাদারদের দালালদের হয়ে।"[৫১] অথচ প্রহসনের মতো উজ্জাপিত হয় স্বাধীনতা দিবস। মানবিক এস. ডি. ও. দারুণ যন্ত্রণা ও অসহায়তায় ব্যঙ্গের মতো বলতে থাকেন- "ওখানে তো আকাল নেই। তবে যাব একবার। স্বাধীনতার চল্লিশ বছর কীভাবে পালন করা হবে সে বিষয়ে মাইকে বক্তৃতা দেব। ভাই আর বোন! স্বাধীনতা দিবস পবিত্র দিবস। ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে...সবাই যে যার ঘরে পতাকা তুলবেন, খুশি মনাবেন, ধুম মচাবেন, ঘর ঘর দীপ জ্বালাবেন আর রাজৌরাতে মিটিঙে অবশ্য যাবেন।"[৫২] সরকার পিরথাকে দুর্ভিক্ষমুক্ত করতে প্রয়াসী হতেই পারত, কিন্তু তাদের রেকর্ডে পিরথায় দুর্ভিক্ষ নেই। তাই সরকারের তরফ থেকে তারা পায় "পরিবার পরিকল্পনার পোস্টার"। অবশ্য সেই পোস্টারের কাগজ বা আরও অন্য পোস্টারের কাগজ তাদের বাচ্চাকে শোয়াতে বা ঘরের দরজায় লাগিয়ে হাওয়া আটকাতে কাজে লাগে। সন্তান উৎপাদনের ধারণায় উচ্চবিত্তের সঙ্গে নিম্নবিত্তের পার্থক্য আছে। সন্তানের সঙ্গে উচ্চবিত্ত যখন পালনের ধারণায় যুক্ত, নিম্নবিত্তে সেই সন্তান শৈশব থেকেই অন্ন সংস্থান ও পারিবারিক দায়িত্ব পালনের অংশীদার হয়ে

ওঠে, কেউ কাঠ কেটে আনে, কেউ ঘরের ছোটো ভাই-বোনেদের সামলায়, কেউ চলে যায় বাবা-মার সঙ্গে কাজের সহযোগী হয়ে, শিশু অবস্থা থেকেই তারা নিজেদের অন্নের সংস্থান নিজেরাই করে নেয়। করে নিতে শিখে যায়। এই প্রসঙ্গে পূরণের মধ্যে শোনা যায় ঔপন্যাসিকের কণ্ঠস্বর– "সমাজের যে স্তর গরিব, সে স্তরে জনসংখ্যা বাড়বে, বাড়ছে। ভারতবর্ষ ১৯৯১ সালে তাদের মাথা গুনবে এইমাত্র। আর দেবে না কিছু, শিক্ষা, বাঁচার সুযোগ, মানুষ হবার উপায়। স্ত্রী-সঙ্গমই সে স্তরে একমাত্র সুখ, ভেতরে জমে থাকা ব্যর্থতার যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবার উপায় এবং বাপ মা যতদিন দারিদ্র্য-সীমার অনেক নীচে, ততদিন গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয় থাকলেও বর্ষে বর্ষে দলে দলে শিশুরা হয়ে যাবে শিশু শ্রমিক, উপার্জনের সহায়।"[৫৩]

দীর্ঘদিন ধরে সরকারি বঞ্চনার শিকার হয়ে এসেছে তারা, বছর বছর দুর্ভিক্ষে মরে, বছর বছর অনাহারে মরে, আত্মহত্যা করে, সন্তানকে বিক্রি করতে বাধ্য হয়, একসময় তারা বিশ্বাস করে সরকার তাদের ত্যাগ করেছে, কোনো কিছুই তাদের প্রাপ্য নয়, অধিকার নয়, এমনকি বৃষ্টিও। তারা মিরাক্যালের আশায় বাঁচে। তাই যখন বিডিও নিজের উদ্যোগে ত্রাণ নিয়ে আসে, তখন কান্নায় ভেঙে পড়ে- "...সেই তো সাহারা আনলে সরকার! আগে আনলে মাগনিকে আমি বেচতাম না।"[৫৪] দীর্ঘ বঞ্চনা ও ঔদাসীন্যের ফলস্বরূপ যখন তারা বাদুড়ের মতো কোনো অপরিচিত পাখির ছায়া তাদের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যেতে দেখে এবং বিখিয়া তার ছবি আঁকে যা তাদের কাছে একেবারেই অপরিচিত, তাকে তারা পূর্বপুরুষের অশান্ত অশুভ ছায়া বলেই বিশ্বাস করে। পুরো আদিবাসী গ্রাম মৃত্যুর প্রতীক্ষা করে। অশৌচ পালন করে। "ডেথ উইশ" করে। কখনও বলে– "সরকার তো চায় না আমরা বাঁচি। তাতেই কোনো সাহারা দেয় না। পূর্বপুরুষদের অপমান হয়ে গেল, আমরা তাদের সম্মান রাখতে পারি না। আমরা বাঁচব কি মরব সে তো আমাদের হাতেই নেই।"[৫৫] কখনও বলে- "হাঁ

শংকর ! আমরা সবাই মিলে মরব কবে? – শংকর! এবার রিলিফ এল কেন ?- শংকর ! বৃষ্টি হল কেন ? বৃষ্টি ওদের পাওনা নয়, রিলিফ ওদের পাওনা নয়, পূর্বপুরুষের আত্মা ছায়া ফেলে ঘুরে গেছে, তাই নিঃশেষে মৃত্যুই ছিল ভবিতব্য।''[৫৬] পূর্বপুরুষের আত্মার অশান্ত হওয়ার কারণ অনুসন্ধান করে নিজেদেরই কৃতকর্মের মধ্যে। এই কৃতকর্মের সংশয়ায়িত পাপবোধের সঙ্গে মিশে আছে পূর্বপুরুষদের জমি, অরণ্য, ঘর রক্ষা করতে না পারার আক্ষেপ আর এই আক্ষেপসূত্রেই উঠে আসে তাদের ওপর হয়ে আসা যুগ যুগব্যাপী শোষণের ইতিহাস। অনেক অনেককাল আগে, শংকরের কথায় অনেক ''চাঁদ'' আগে তাদের সব ছিল- বন, পাহাড়, নদী, চাষের জমি। ছিল পূর্বপুরুষের সমাধি– ''মরে গেলে আমরা সমাধি দিতাম। মৃতদেহটি চৌমাথায় নামাতাম। ছড়িয়ে দিতাম কোদোর দানা, ধানের বীজ। তারপর সমাধি দেবার সময়ে সঙ্গে দিতাম তেল, বস্ত্র, ধান, ফল। শুইয়ে দিতাম তাকে পূর্বপুরুষের কাছে। শ্রাদ্ধ হয়ে গেলে সমাধির ওপর দিতাম পাথর। এমন শ্মশানভূমি অনেক, অনেক।''[৫৭] যে সমাধিক্ষেত্র ছিল তাদের পবিত্রতম স্থান, সেই পবিত্রতা নষ্ট হয়ে যায় মূলস্রোতের মানুষের আগ্রাসনে। তাদের সংস্কৃতি বাঁচাবার চেষ্টাটুকু না করেই সেই সমাধিক্ষেত্র ভেঙে তৈরি হয়েছে রাস্তা, বাড়ি ইত্যাদি। ঔপন্যাসিক উপন্যাসের ভূমিকা অংশে লিখছেন– ''এমন ঘটনা (সমাধিক্ষেত্র দখল নেবার ঘটনা) পুরুলিয়াতে কিছু হয়েছে বলে ১৯৮৮–র মে মাসে জেনে এসেছিলাম। এমন বহু নির্বোধ কাজ করে আদিবাসীদের খোঁচানো চলে, ফলে এক সময় ওঁরা প্রতিবাদী হতে বাধ্য হন। মূলস্রোতের নিদারুণ অবজ্ঞা-উপেক্ষা ও অজ্ঞতার জন্য আদিবাসী সমাজের সঙ্গে মূলস্রোতের মধ্যে এই সমান্তরতার ব্যবধান, যে ব্যবধান ঘোচাবার দায় মূলস্রোতের ছিল।''[৫৮] শুধু সমাধিক্ষেত্র দখলই নয়, জমি, অরণ্য, ঘর এবং স্বাধীনতাটুকুও তারা হারিয়েছে। গভীর বেদনায় শংকর নাগেসিয়া তাদের রাজা থেকে প্রজা, প্রজা থেকে দাস হওয়ার শোষণকে বলে যায়, আদিবাসীদের জীবনের সঙ্গে তাদের ওপর

অনাদিবাসী শোষণ যখন নির্মম বাস্তব, পাঠক চমকে ওঠেন এটা জেনে হো ভাষায় ‘‘শোষণে’’র কোনও সমার্থক শব্দ নেই। ‘‘পূরণের মনে হয়, যাদের জীবনে শুধুই শোষণ, শুধু বঞ্চনা, সেই আদিবাসীদের কোনো ভাষাতেই কি আছে ‘শোষণ’ শব্দের সমার্থক শব্দ?’’[৫৯] নিরন্তর বঞ্চনা, শোষণ ও সরকারি উদাসীনতার প্রেক্ষিতে পিরথায় টেরোড্যাকটিলের ছায়া তাদের মধ্যে এমন চরম হতাশা তৈরি করে যে, তারা মৃত্যু ভিন্ন অন্য কোনো পথ তাদের জন্য থাকতে পারে - একথা বিশ্বাস করতে পারে না, ‘‘ডেথ উইশে’’ গা ভাসিয়ে দেয়। বিখিয়া সেই আদিম, বিপন্ন টেরোড্যাকটিলের মধ্যে নিজেদের পূর্বপুরুষের ছায়া ও বিপন্নতাকেই হয়তো প্রত্যক্ষ করেছিল, তাই পালন করেছিল অশৌচ এবং অশৌচ শেষে ‘‘তেলনাহান’’। সরকারের ব্যর্থতার সুযোগে কিছু অসাধু এন. জি. ও সংস্থা ও কৌশলজির মতো লোক ত্রাণের নামে আসলে নিজেদের আখের গোছায়। ত্রাণের ছবি তোলে, চমৎকার ছবি ওঠে এক কঙ্কালসার শিশুকে জড়িয়ে এক বৃদ্ধার খিচুড়ি নেওয়া- বহুমূল্য ছবি। এ ছবি কৌশলজির স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে এনে দেবে দেশি-বিদেশি টাকা। মানুষের অসহায়ত্ব, দারিদ্র্য, আত্মসম্মানটুকুও এভাবে বিক্রি হয়ে যায়। কৌশলজি প্রস্তাব করে তার গড়ে তোলা আদিবাসী কলোনিতে নেমে যাওয়ার এবং এই সব এলাকা, সমাধিস্থল হয়ে উঠবে বিনিয়োগ, পর্যটনের কেন্দ্র। হয় নিজেদের সংস্কৃতি ভুলে মূলস্রোতে মিশে যাও, নয়তো পূর্বপুরুষের জায়গাকে, সংস্কৃতিকে বুকে আঁকড়ে ডুবে যাও অবহেলা আর অনাহারের চোরাবালিতে। অন্য আর কোনও বিকল্প নেই। অথচ প্রাচীন সভ্যতার এই ধারকদের তাদের সংস্কৃতিসহ রক্ষা করাই ছিল মূলস্রোতীদের দায়িত্ব- বহুযুগ আগের সময়পর্ব থেকে উঠে এসে বিলুপ্ত প্রাণী বুঝি পূরণের চোখে চোখ রেখে তার বিপন্ন আত্মীয়দের উদ্ধারের অনুরোধটিই বোধহয় করে গেল।

ভগীরথ মিশ্রের *তস্কর* (১৯৯২) উপন্যাসের শুরু বাণেশ্বর ঘোষের বাড়িতে গোক্ষুরের আগমনে এবং শেষও বাণেশ্বর ঘোষের বাড়িতে গোক্ষুরের আগমন ও মৃত্যুযন্ত্রণায়। মধ্যেখানের পরিসরে গোক্ষুর ভক্তার দক্ষ চোর থেকে চোর হওয়ার আয়োজন, প্ররোচনা, ভয় থেকে চোর না হতে চাওয়ার কঠিন যাত্রা। আর এই পরিসরেই ঔপন্যাসিক তুলে আনলেন তৎকালীন সময়, লোধাদের লাঞ্ছিত জীবন ও তাদের প্রতি উচ্চবর্গের মানসিকতার সার্বিক পরিচয়। উপন্যাসের পটভূমি যে মেট্যাল গ্রাম, সেই গ্রামের জনজীবনের পরিচয় দিতে গিয়ে ঔপন্যাসিক লিখলেন– "ডিহিপার লোধাপাড়া নিয়ে মেট্যাল গাঁয়ে প্রায় শ'দুই ঘরের বাস। তার মধ্যে বাণেশ্বর ঘোষ একজনই।...বাকি সবাই ভাগ-চাষী, ছোট-চাষী, মুনিশ-মাইন্দার। খাটে-বাটে। খেয়ে, না খেয়ে থাকে। খাটা-বাটা না পেলে পেটে ভিজে গামছা জড়িয়ে শুয়ে থাকে। আর আছে বিশ-তিরিশ ঘর লোধা, তাদের অবস্থা আর কহতব্য নয়।"[৬০] গোক্ষুর ভক্তা একজন লোধা। পেশায় চোর। অবশ্য চুরির সব মালই সে বেচে বাণেশ্বর ঘোষের কাছে, যে বাণেশ্বর ঘোষ গ্রামের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। গ্রামে চুরি–ডাকাতি বৃদ্ধি নিয়ে বক্তৃতা দেন, প্রকাশ্যে চুরি নিয়ে বিচারে বিশেষ সক্রিয় হয়ে ওঠেন। বাণেশ্বরের নির্দেশ মতো চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়লে গোক্ষুর দেখেছে বাণেশ্বর ঘোষই বিচারের নামে দৈহিক অত্যাচার চালায় সবচেয়ে বেশি, সরল গোক্ষুরের মাথায় এই হিসেব ঢোকে না, সে প্রশ্ন করে- "তুমরাই চুরি কত্তে পাঠাও, তুমরাই মাল লও, ফের ধরা পড়লে তুমরাই বেশি দাঁত কিঁড়িমিড়ি কর, ক্যানে ঘোষদা?"[৬১] "তুমরা" শব্দটি বহুবচনার্থক অর্থাৎ শুধু বাণেশ্বর ঘোষ শুধু নয়, গোক্ষুরের চুরির গোপন খবর ও লাভের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে থানার বড়োবাবুও। গোক্ষুরের এই প্রশ্নের উত্তর আসলে উচ্চবর্গের লোভ ও ঘৃণ্য মানসিকতা, যার শিকড় খুঁজতে গেলে পৌঁছে যেতে হবে ব্রিটিশ যুগের কালিমালিপ্ত সময়ে, আইনে।

ব্রিটিশ শাসনকালে শাসকদল লক্ষ করেছিল যে, বেশ কিছু গোষ্ঠীর দ্বারা অসামাজিক কাজ ঘটে থাকে। জাতিভিত্তিক বণ্টিত ভারতীয় সমাজে এই অসামাজিক কাজ বংশপরম্পরায় ঘটতো বলে ধরে নিয়ে তারা ১৮৭১ সালে "Criminal Tribes Act"–এর প্রচলন করেন। এদেশের আদিবাসী সম্পর্কে ইংরেজদের তখনও পর্যন্ত সম্যক ধারণা ছিল না বলেই তারা কিছু আদিবাসীকে সাধারণ আদিবাসীর তালিকায় আর বাকি আদিম জনজাতিকে এই "অপরাধপ্রবণ জাতি"র অন্তর্ভুক্ত করেন। ১৮৭১ সালে CTA চালু হয় মূলত উত্তর ভারতের কিছু অংশে। ১৮৭৬ সালে তা লাগু হয় বাংলা প্রেসিডেন্সিতে - "In 1876 the Act was extended to certain parts of Bengal and in 1897 it was amended to enlarge the powers of the local government to notify communities and take action against a part of the 'gang' or community."[৬২] ১৯১১ সালে এই আইন মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে ও সংশোধিত হয়ে ১৯২৪ সালে এই আইন ভারতজুড়ে বলবৎ করে ব্রিটিশ সরকার। লোধা ভারতের আদিম জনজাতি। কৃষিকাজে অজ্ঞ এই জাতির মূল জীবিকা ছিল শিকার ও বন থেকে খাদ্য সংগ্রহ। ব্রিটিশ সরকারের বনকেন্দ্রিক নীতি ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে তাদের আশ্রয় ও জীবিকার উৎস জঙ্গল চলে গিয়েছিল জমিদারদের হাতে। সম্ভবত এই আশ্রয়হীনতা ও জীবিকার সংকটে কৃষিকাজে অনভ্যস্ত লোধারা অপরাধের পথ অনুসরণ করেছিল বংশপরম্পরায়। স্বাধীনতার পর পরই ভারত সরকার এই আইন প্রত্যাহার করেন এবং ১৯৫২ সালে এই তালিকাভুক্ত সমস্ত জাতিকে "বিমুক্ত জাতি" ঘোষণা করেন। ১৯৫৬ সালের অক্টোবর থেকে পশ্চিমবঙ্গে লোধারা "তপশিলি উপজাতি"ভুক্ত হয়। ভারত সরকার থেকে আইন করে "অপরাধপ্রবণ জাতি"র অপবাদ থেকে লোধাদের মুক্তি দিলেও এই দেশের মানসিকতা এমনকি পুলিশ, যারা দেশের প্রশাসনের একটা অংশ- তারাও লোধাদের সম্পর্কে এই ধারণা থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি। *তস্কর* উপন্যাসে

তাই দেখি চুরিরোধের মিটিঙে লোধাদের উপস্থিত থাকতেই হয় শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও, প্রশাসনের উৎপাত চলে– "রাতের বেলায় সহজে সাড়া দিতে কিংবা দরজা খুলতে ভয় পায় এরা। পুলিশের ভয় তো আছেই। ওরা মাঝে মাঝে এসে লোধাদের আগড়ে মারে লাঠির ঘা। দরজা খোলায়। ধমক ধামক দেয়। জেরা করে অনেকক্ষণ ধরে। যাবার সময় মুরগির ভাড়ি খুলে, তুলে নিয়ে যায় মুরগী। মাঝে মাঝে গাঁয়ের লোকজনও এসে হামলা জোড়ে। হয়তো গাঁয়ের কারো ঘরে চুরি-চামারি হলো, হয়তো অন্য কোনও দল কাজটা করলো, গাঁয়ের লোক কিন্তু উত্তেজিত হয়ে হামলা চালাবে লোধাপাড়ারই বাছাবাছা লোকের ওপর। ধরে নিয়ে গিয়ে পিছমোড়া করে টাঙিয়ে দেবে বাসন্তীতলার নাটমণ্ডপে।"[৬৩]

সামাজিক বিন্যাসে একেবারে নীচের স্তরে খাদ্যসংগ্রহের সঙ্গে যুক্ত আদিবাসীরা, যারা খাদ্য উৎপাদনে অনিচ্ছুক, অথচ জঙ্গলে খাদ্যসংগ্রহের ক্ষেত্রে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে চৌর্যবৃত্তি, ছিনতাই, ভিক্ষাবৃত্তি বা অন্য অসামাজিক কাজের সঙ্গে যুক্ত হতে বাধ্য হয়, লোধারা তেমনই এক গোষ্ঠী। ঔপন্যাসিক বিভিন্ন লোধা ও তাদের বংশের উল্লেখ করে বংশ পরম্পরায় অসামাজিক কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকা লোধা ইতিহাসের সাহিত্যিক নির্মাণ ঘটালেন। উপন্যাসের মূল চরিত্র গোক্ষুর ভক্তার বাবা ক্ষীরোদ ভক্তা ছিল ডাকাত। ঢেঁকি দিয়ে গৃহস্থের ঘরের দরজা ভেঙে লুট করত সর্বস্ব। রোগাসোগা কাকা বিনোদ ভক্তার পক্ষে তা সম্ভব ছিল না বলেই সে জীবিকার পথ হিসেবে বেছে নিয়েছিল চৌর্যবৃত্তিকে। গোক্ষুরের চুরিতে হাতেখড়ি ছোটোবেলায় কাকার কাছেই। তিন ভাইয়ের মধ্যে গোক্ষুর বড়ো। মেজ ভাই লোধাশুলির দিকে ট্রাক-লুঠের দলে ভিড়েছে। ছোটোভাই মকর কানে শোনে না, তাই এইধরনের কাজে অনুপযুক্ত বলেই পারিবারিক অসামাজিক কাজের গণ্ডি থেকে সে বেরিয়ে আসে। মকরের চুরি-ডাকাতি না করা ছিল বাধ্যতা, কিন্তু গোক্ষুরের চুরি ছেড়ে দিতে চাওয়া একান্তভাবেই তার ইচ্ছে এবং অনুভূতিজাত। পোয়াতি স্ত্রীকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারেনি সে। চুরি করে বাণেশ্বর ঘোষের কাছে বিক্রি করে

মাত্র ষাট টাকা নিয়ে বাড়ি ফিরে সে দেখেছে স্ত্রী মারা গেছে। মৃত্যুকালে স্ত্রীর পাশে থাকতে না পারা, বাঁচানোর চেষ্টা করতে না পারার অনুতাপ গোক্ষুরকে পাল্টে দেয়। চুরি করা ছেড়ে দিতে চায় সে। কিন্তু লোধাদের চুরির মালে লাভ তো অন্যদের। তারা চুরি ছাড়তে চাইলেইবা ছাড়া হবে কেন! বর্ণব্যবস্থার ওপর আস্থা রাখা বাণেশ্বর ঘোষের কাছে লোধাদের চুরি করা সূর্যোদয়-সূর্যাস্তের মতো সত্যি, যার বদল ঘটে না বা ঘটতে দেওয়া চলে না, তাহলে বাণেশ্বর ঘোষেদের সিন্দুক ভরবে না – "...লধ্বা চুরি করবে নি, সমাজ-সংসার তা'লে চলবে কি করিয়া? কথায় বলে, লধ্বা চোর, লধ্বার গুটি চোর, লধ্বার পাদ্‌টি চোর। সেই লধ্বা কয় কিনা, মুই আর চুরি করবো নি!"[৬৪] উচ্চবর্গের এই স্বর শুনি নলিনী বেরা'র *শবরচরিত (প্রথমপর্ব)* উপন্যাসের বঙ্কা মাহাত বা লক্ষণ পাতরের গলায়ও। বিয়ের যৌতুকের জন্য লক্ষণ পাতর রাইবু লোধার কাছে চুরি করা বাসন-কোসনের খোঁজ করে, বঙ্কা মাহাত রাইবুকে সাহায্যের মধ্যে দিয়ে রাইবুর কাছ থেকে চুরির মাল অন্য মহাজনের বদলে তার কাছে বিক্রির প্রতিশ্রুতি আদায় করে নেয়– "রাইবুলোধা সাইকেলের কাছাকাছি এলে তার কানে ফিসফিস করে বলল, তালে ঐ কথাই থাকছে? চুরির যাবতীয় জিনিস, বাসন-কোসন, সোনাদানা, –স-ব আমার দোকানে বেচবি?"[৬৫] ফলে, লোধা চোর থেকে যায়, কারণ সমাজের কিছু মানুষের পক্ষে লোধাদের চোর থাকাটাই লাভজনক। যে জঙ্গল খাদ্য উৎপাদনে অক্ষম লোধাদের একমাত্র আশ্রয় ছিল এবং সেই জঙ্গলের অধিকার চলে যাওয়ায় নিতান্ত পেটের তাগিদে চৌর্যবৃত্তির মতো অসামাজিক পন্থা গ্রহণ করেছিল লোধারা, কিন্তু এই সব বাণেশ্বর ঘোষ, বঙ্কা মাহাত, লক্ষণ পাতররা সেই লোধাদের থেকেও অপরাধী। কারণ, চুরির মালে লোধাদের দু'বেলা ভরপেট খাওয়াও জোটে না, অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য তো দুরস্ত; ফুলে ফেঁপে ওঠে শুধু বাণেশ্বর ঘোষেরা। মুরলী কোটালের মেয়ে পঞ্চমীর স্বামী চুরি করতে গিয়ে গণপিটুনিতে মারা যায়। পঞ্চমী ও মুরলী বাণেশ্বরের নির্দেশে চুরি করতে গিয়ে প্রায়

ধরা পড়া আশ্রিত গোক্ষুরকে গণপিটুনির হাত থেকে রক্ষা করে। গোক্ষুরকে এই পথ ছেড়ে দিতে বলে। এই প্রসঙ্গে বুড়ো মুরলী শোনায় তার ডাকাত জীবনের গল্প। যৌবনকালে দুর্ধর্ষ ডাকাত মুরলী কোটাল হরিশ ভট্টাচার্যের কূটনৈতিক কৌশল ও বুদ্ধির জেরে ডাকাতি করতে গিয়ে বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং ধরা পড়ে জেল খাটে। জেল থেকে ফিরে মুরলী প্রতিহিংসাবশত হরিশ ভট্টাচার্যের বাড়ি লুট করার জন্য হামলা চালায়, এবারও হরিশ ভট্টাচার্যের পূর্ব প্রস্তুতি ও বুদ্ধির জেরে দরজা ভাঙতে সে অকৃতকার্য হয়। রাগে অন্ধ মুরারী এবার নৃশংস পন্থা অবলম্বন করে, দরজার বাইরে শিকল তুলে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে মারে হরিশ ভট্টাচার্যের পুরো বংশকে। সেদিন মুরলী যে নৃশংসতা ঘটিয়েছিল নিরীহ মানুষগুলোকে পুড়িয়ে, তার অনুশোচনাই মুরলীর শরীরে জ্বালা ধরায়। তাকে অনুতাপে দগ্ধ করে, তাড়া করে- "এখন, এই বৃদ্ধ বয়সে মুরলী কোটালের সর্বাঙ্গে জ্বালা। পোড়া পোড়া জ্বালা। দিনে চার-পাঁচ বার বামন-গেড়িয়ায় ডুব দিয়েও সে জ্বালা কমে না।"[৬৬] আমাদের শেক্সপীয়ারের *ম্যাকবেথ* নাটকের কথা মনে পড়ে। রাজা ডানকানকে হত্যার পর ম্যাকবেথের অবস্থাও অনুরূপ হয়েছিল- "What hands are here ? Ha: they pluck out mine eyes. Will all great Neptune's ocean wash this blood Clean from my hand?"[৬৭] কিংবা স্মরণ করতে পারি লেডি ম্যাকবেথের দশা– "Here's the smell of the blood still; All the perfumes of Arabia will not sweeten this little hand. O, O, O!"[৬৮] বাবার বিলাপ ও স্বামীর শোচনীয় মৃত্যুতে পঞ্চমীও সিদ্ধান্ত নেয় দ্বিতীয়বারের জন্য কারোর সঙ্গে ঘর বাঁধার সুযোগ ঘটলে চুরি-ডাকাতির মতো অসামাজিক কাজের সঙ্গে যুক্ত কারোর হাত সে ধরবে না। গোক্ষুরকে ঝুঁকি নিয়ে বাঁচানোর ফলে পঞ্চমীর প্রতি ভালোবাসা তৈরি হয় তার। ফলে, পঞ্চমীকে পেতে মরিয়া গোক্ষুর স্ত্রীর মৃত্যুতে যে চুরি না করার যে সিদ্ধান্তে ঝুঁকেছিল, তাতে আরও দৃঢ়সংকল্প হয়।

ঔপন্যাসিক লোধাদের চোর-ডাকাত হওয়া জীবন থেকে উজ্জ্বল উত্তরণের ছবি আঁকলেন মধু মল্লিকের মধ্যে দিয়ে। মধু মল্লিক লোধাদের মধ্যে সায়েন্স গ্র্যাজুয়েট। বাবা ঠুরকো মল্লিক ছিল ডাকাত। পরে চোখে ছানি পড়ায় সে পেশা ছেড়ে দেয়। ছোটো থেকে মেধাবি মধু মল্লিককে শুধু দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করতে হয়নি, লড়াই করতে হয়েছে ঘৃণার সঙ্গে, উচ্চবর্গের ঘৃণার সঙ্গে, বাস্তবে চুনি কোটাল বা রোহিত ভেমুলার মতো। আশার কথা এই, মধু হেরে যায়নি। ঔপন্যাসিক তাকে জিতিয়ে দিয়ে লোধাদের সামনে পথ খুলে দিলেন। মধুর লড়াইটা সহজ ছিল না। "লোধার পুত্তুর হয়্যা, সে নাকি ইংরাজী ইস্কুলে পড়া-লেখা করবে! এ কি তাজ্জবের কথা!"[৬৯] মধুর বাবার কাছেই যা অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়েছিল, বাকিদের কাছে যে তা বিরক্তি উৎপাদন করবে, বলাই বাহুল্য। মেট্যাল স্কুলের হেডমাস্টার এমনই একজন। নিতাই মাস্টারের উদ্যোগে ও ডি. আই-এর নির্দেশে তিনি মধুকে স্কুলে নিতে সম্মত হয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু রক্ষণশীল হিন্দু বর্ণব্যবস্থা ও জাত-পাতে ঘোরতর বিশ্বাসী জ্যোতিশ্বর রায় লোধা বালক মধুর থাকার ব্যবস্থা করলেন হোস্টেলের ঘরের বদলে স্কুলেরই একতলার ঘরের একপাশে। কিন্তু বেতন বা বোর্ডিং চার্জ মুকুব করা হল না। ব্যবস্থা হল, স্কুল করে সে আশেপাশের গ্রামের সম্পন্ন মানুষদের কাছ থেকে নিজে গিয়ে জোগাড় করে আনবে সেই টাকা। স্কুলে ভর্তির পর থেকে মধুর নিত্য গ্লানিকর জীবন শুরু হয়েছিল স্কুলে সহপাঠীদের ও গ্রামের নিত্য ভিক্ষায় জোটা ঘৃণায়। সমাজে লোধাদের প্রতি ঘৃণা কত দূর পর্যন্ত শিকড় বিস্তার করেছিল, তা বোঝা যায় সহপাঠী কিশোরদের বিদ্রূপে। এই বিদ্রূপ প্রমাণ করে সমাজের গা থেকে, মন ও মানসিকতা থেকে লোধাদের "অপরাধী" অপবাদ মুছতে লেগে যাবে আরও বহু বছর। মধু মল্লিকদের লড়াই তাই থেমে থাকে না। নিজেদের প্রমাণ করতে করতে কখনও কখনও কি ক্লান্ত হয়ে যায়? আর তখনই কি হয়ে যায় চুনি কোটাল? এই ঘৃণার শোষণ বন্ধ করতে অক্ষম রাষ্ট্রও অপরাধী, দোষী। অথচ অপচয়ে

নষ্ট হয়ে যাওয়া লোধা কৈশোরও অন্যভাবে বাঁচতে চেয়েছিল– "এইভাবে নিঃশেষ হয়ে যেতো মাসের সবগুলি বিকেল। সে ছিল তার ভর-ভরন্ত কৈশোরের দিন। মন সারাক্ষণ ছুটতে চায় চাবুক খাওয়া ঘোড়ার মত। ছেলেমানুষী নানান ক্রিয়া-কাণ্ডে লিপ্ত হতে চায় মন। শেষ বিকেলে খেলার সবুজ মাঠ জুড়ে আহ্লাদী হাওয়া। শাল বনের সবুজ হাতছানি। গাছে গাছে ফল-পাকুর। নদীর ধারে মসৃণ বালি। তিরতিরে কাকচক্ষু জলে গাছেদের নম্র ছায়া। পাখির কিচির-মিচির গান। সব কিছুকে তুচ্ছ করে, এক পেট ক্ষিদে বয়ে বয়ে, সে ঘুরে বেড়াতো চটের বস্তা কাঁধে চাপিয়ে। আকূল প্রার্থনায়, আকণ্ঠ অভিমানে।"[৭০] আর সেই অভিমানেই ছেড়ে দিতে চেয়েছিল স্কুল। জীবনের বাঁক ঘোরে যখন নিতাই মাস্টার তাকে লোধা বাচ্চাদের জন্য গড়া "বিদিশা"তে নিয়ে আসেন। আর পেছনে ফিরে তাকায়নি মধু। লোধাপাড়ার সায়েন্স গ্র্যাজুয়েট সে। তবু লড়াই তার থামেনি। নিতাই মাস্টারের সঙ্গী হয়েছে সে। লোধাদের কেন্দ্র করে উপন্যাসে স্পষ্টতই দু'টি শ্রেণি দেখা যায়। বাণেশ্বর ঘোষেরা একদল, যারা লোধাদের চুরির মালে গোপনে বড়োলোক এবং আরও বড়োলোক হয়, কিন্তু প্রকাশ্যে ঘৃণা বর্ষণ করে, এইদলে থানার বড়োবাবুরাও জোটে যারা লোধাদের আইনের ভয় দেখিয়ে বাণেশ্বর ঘোষেদের পাশে দাঁড়ায়, রাষ্ট্রের উর্দি পরে অত্যাচার চালায়। তাই, এই বড়োবাবুর কোনো নাম ঔপন্যাসিক দিলেন না লোধাদের ওপর ব্যক্তিনিরপেক্ষ পুলিশি নিগ্রহকে স্পষ্ট করতে। জ্যোতিশ্বর রায় বা সুকুমার পুরোহিতরা এই শ্রেণিতেই পড়েন, কারণ তাঁরা তাঁদের বুক ভরা ঘৃণা নিয়ে লোধাদের অতীত ভুলতে দেয় না। অন্যদিকে, লোধাদের জন্য অনেক উদ্যোগ ও ব্যর্থতা, আশা আর হতাশা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন শ্যাম চক্রবর্তী ও নিতাই মাস্টাররা। অথর্ববেদী ব্রাহ্মণ বলে হিন্দু সমাজে শ্যাম চক্রবর্তীর যজমানী নিষিদ্ধ। তাই লোধা সমাজে পুজো করে পেট চালান শ্যাম চক্রবর্তী। লোধা সমাজে হিন্দু পুরোহিত দিয়ে পুজো স্বীকৃত। তাদের আরাধ্য দেবদেবী হলেন শিব, শীতলা, চণ্ডী, মনসা, কালী,

বনদেবী, বড়াম প্রমুখ। শ্যাম চক্রবর্তী তাঁর উদার মনোভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন পূজা অনুষ্ঠান নেহাতই বাহ্যিক ক্রিয়ামাত্র, ঈশ্বর ভজনার সঙ্গে তার কোনও যোগ নেই। প্রকৃত ঈশ্বর সাধনা ব্যক্তির নিজস্ব, পুরোহিত বা পূজার সঙ্গে তার কোনও লগ্নতা নেই। শ্যাম চক্রবর্তীর এই গূঢ় ঈশ্বরচেতন শুধু লোধারা বোঝে না তাই নয়, বর্ণহিন্দু তাবড় ব্রাহ্মণও বোঝে না। ফলে, নিজ সমাজে অসম্মানিত ও বিতাড়িত শ্যাম চক্রবর্তী লোধা সমাজকে আপন করে নেন। সুখে-দুঃখে পাশে থাকেন। তাদের প্রতি প্রচ্ছন্ন মমত্ব অনুভব করেন। এই মমত্ব থেকেই লোধা সমাজের ভালোর ভাবনা তাকে তাড়িয়ে বেড়ায়। পড়াশোনা ভিন্ন লোধাদের মুক্তি নেই বলেই মধুকে তিনি কখনও অনুরোধ করেন, কখনও তিরস্কার করে- "দ্বিগুণ চটে  যায় শ্যাম চক্রবর্তী, 'যদি ওরকমই নয় তুই, কত করিয়া কইলাম, তাও সন্ধ্যেবেলায় পাড়ার ছা-গুলাকে পড়ালু নি ক্যানে? বল্? তোর চাইতে শিক্ষিত হয়্যাবে অরা? তোর মাতব্বরি মানবে নি, সেই কারণে? বল্!"[৭১] নিতাই মাস্টারের সূত্র ধরে ঔপন্যাসিক উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহের সময়কালকে স্পষ্ট করেছেন। বারবার এসেছে জরুরি অবস্থা ও মিসা আইনের প্রসঙ্গ। ১৯৭৫ সালে জুন মাসে রাষ্ট্রপতি ফকরুদ্দিন আলি আহমেদ ভারতে জরুরি অবস্থা জারি করেন, প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর পরামর্শে। এই সময়ই জারি হয় মিসা অর্ডিন্যান্স। এই মিসা আইনের বলে দেশের আইনের রক্ষকদের হাতে এমন ক্ষমতা দেওয়া হয় যে কোনোরকম ওয়ারেন্ট ছাড়াই যে কোনো ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা যাবে, যে কোনো সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা যাবে। ১৯৭৭ পর্যন্ত এই জরুরি অবস্থা চলেছিল। উপন্যাসের কাহিনিকাল এই সময়পর্বের। নিতাই মাস্টারের কাজকর্ম কৃষকমুখী, গোক্ষুরের ভাবনায় পাই– "মানুষটা সেই কবে থেকে গরীবের হয়ে লড়াই চালাচ্ছে নাগাড়ে।...আজও সে পুলিশের তাড়া খেয়ে লুকিয়ে বেড়াচ্ছে। বনে-জঙ্গলে গোপন-বৈঠক করে চলেছে। অন্তরাল থেকে মজুরী বৃদ্ধির আন্দোলন, বর্গা চাষীদের ন্যায্য ভাগ ইত্যাদির জন্য লড়াই চালাচ্ছে।"[৭২]

উপন্যাসে গোক্ষুরের স্মরণপথ বেয়েই এসেছে বাংলায় যুক্তফ্রন্ট শাসনের সময়ে বেনামি জমিতে লাল ঝাণ্ডা পুঁতে দেওয়া, টিপছাপের ভুয়ো দলিল জ্বালিয়ে দেওয়ার মতো গরিব কৃষক ও গরিব মানুষদের লাল টুকটুকে স্বপ্নের মতো দিনের কথা। পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট দলগুলো সরকার গড়ার আগে দু'বার অকংগ্রেসি যুক্তফ্রন্ট সরকার গড়ে। প্রথমবার ১৯৬৭ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে নভেম্বর, দ্বিতীয়দফায় ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে ১৯৭০ সালের মার্চ পর্যন্ত। এরমধ্যে ঘটে গেছে নকশালবাড়ি অভ্যুত্থান ১৯৬৭-এর ২৪শে মে। যুক্তফ্রন্ট শাসনকালে পশ্চিমবঙ্গে ভূমিসংস্কার কর্মসূচি গৃহীত হয় ও রূপায়িত হয়। দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতনের সঙ্গে সঙ্গে সরকারি ভূমিবণ্টন কর্মসূচির যে তখনকার মতো ইতি ঘটেছিল, উপন্যাসে তার ইঙ্গিত আছে। ১৯৭১ থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত অস্থির অবস্থা চলে, গ্রামাঞ্চলে জোতদারদের কায়েমি স্বার্থের ফলে সুযোগমতো ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বণ্টিত জমিও হাতছাড়া হয়ে যায়। তাই নিতাই মাস্টার এই দুঃসময়েও লড়ে যান। কৃষক আন্দোলনের সঙ্গী হিসেবে বেছে নেন গোক্ষুরকে। তাকে চুরি ছেড়ে চাষ করতে পরামর্শ দেন। কিছু খাসজমির পাট্টার ব্যবস্থা করে দিতে চান কিন্তু সময় ও ক্ষমতার কারবারিদের বিরুদ্ধতায় তা হয়ে ওঠে না। অন্যদিকে, গোক্ষুর চাইলেও বাণেশ্বর তাকে চুরি করা ছাড়তে দিতে চান না, নরমে-গরমে গোক্ষুরের ওপর চাপ সৃষ্টি করেন। থানার বাবুর ষড়যন্ত্রে গোক্ষুরকে ডাকাতির কেস দেয় আবার জামিনে ছাড়িয়েও আনে বাণেশ্বর। আসলে, তাকে চাপে ফেলে জামিনের টাকা ফেরতের নামে চুরি করানোর ছিল উদ্দেশ্য। অবশ্য তাতেও যখন লাভ হয় না, তখন চুরি করতে অসম্মত গোক্ষুরের ভিটেজমি ক্রোক করতে আদালতের নির্দেশ বের করে বাণেশ্বর ঘোষ। বিভিন্ন সময়ে বাণেশ্বর ঘোষের কথা মতো টিপছাপ দিয়ে অশিক্ষিত গোক্ষুর গম, টাকা নিয়েছে- "বাণেশ্বর ঘোষের কথামত কত কাগজেই সে টিপ দিয়েছে জীবনে। গোক্ষুর টিপ দে, পঞ্চাত থিকে গম পাবি। গোক্ষুর টিপ দে, তিরপল্ পাবি। পশু লোন

পাবি, ব্যাঙ্ক থিকে। টিপ দে, কর্জ দিচ্ছি টাকা। আরো কত ফিকিরেই ঘোষ টিপ নিয়েছে আজীবন। তার মধ্যে কোন টিপখানা ছিনিয়ে নিল গোক্ষুরের ভিটেখানা, সেটা কি আর জানে গোক্ষুর?"[৭৩] আইনি জটিলতায় গোক্ষুরের ভিটে রক্ষা করতে অক্ষম নিতাই মাস্টারও। অসহায় গোক্ষুর শেষবারের মতো চেষ্টা করে। বাণেশ্বর ঘোষ স্বহস্তে যে দাদা রামেশ্বর ঘোষকে খুন করেছিল, সে ঘটনার গোপন সাক্ষী গোক্ষুর নিজে। সেই ঘটনা গোপন রাখার বিনিময়ে ফিরে পেতে চায় ভিটেজমির অধিকার। এই গোপন সন্ধিতেই বাণেশ্বর ঘোষের বাড়িতে ফেরত নিতে ছোটে তার বন্ধকী দলিল, হিমের রাতের অন্ধকারে। অথচ, গোক্ষুরের সরল বুদ্ধি বাণেশ্বরের খুনে মানসিকতার সঙ্গে পেড়ে উঠবে কেন! বাণেশ্বরের বন্দুকের গুলিতে আহত হয় নিরস্ত্র গোক্ষুর, অথচ নিপুণ খলবুদ্ধিতে তির-ধনুকের ব্যবহারে বাণেশ্বর প্রমাণ করেন গোক্ষুর ডাকাতি করতে এসে আহত হয়েছে। মৃত্যুযন্ত্রণায় কাতরাতে থাকে সে। মধু মল্লিকের দল অপেক্ষা করে ভোরের মধ্যে পুলিশ এলে তারা গোক্ষুরকে নিয়ে যাবে হাসপাতালে। ভোরের তীব্র অপেক্ষায় শেষ হয় উপন্যাস। গোক্ষুর শেষ পর্যন্ত মারা গেছে কিনা ঔপন্যাসিক আমাদের জানালেন না, শুধু অপেক্ষায় রাখলেন এক ভোরের, গোক্ষুরের জন্য, গোক্ষুরদের জন্য এক প্রত্যাশিত ভোরের। আর কানে অনুরণিত হতে থাকল গোক্ষুরের ছুঁড়ে দেওয়া সেই কথাটা– "আচ্ছা, চুরির মাল লিত, বেশ কত্ত, চুরি ছাড়িয়া দিলেও তুমাদের হাত থেকে নিস্তার নাই ক্যানে কও দেখি? চুরি ছাড়িয়া দিলে তখন হাজার উপায়ে লতি-লাঞ্চনা করতে থাক। ডাকাতির কেসে জুড়িয়া দিয়া, বন্ধকী ভিটার দখল লিয়া, লচেত থানা হাজিরা-। ইঁদুরকে যমন খাঁচা কলে পুরিয়া চুবকিয়া চুবকিয়া মারে, ঠিক তেমনি করিয়া হাজার ছলে মারতে থাক মোদের।"[৭৪]

শোষণের দু'ই ভিন্ন রূপ তুলে ধরলেন ভগীরথ মিশ্র তাঁর *আড়কাঠি* (১৯৯৩) উপন্যাসে। শোষণ প্রক্রিয়ার বা কাঠামোর মূলত দু'টি উপাদান– শোষক এবং শোষিত। শ্রেণি, অর্থ, সমাজ, রাষ্ট্রভিত্তিক

যে পক্ষ অপেক্ষাকৃত বেশি ক্ষমতা ভোগ করে সে থাকে শোষকের অবস্থানে, অপরপক্ষ শোষিত। উপন্যাসে ঔপন্যাসিক শোষকের দু'টি ধারণার নির্মাণ ঘটিয়েছেন, একজন মোটা দাগের বা স্থূল এবং তাকে স্পষ্টতই ''আড়কাঠি'' রূপে চিহ্নিত করলেন, অপরজনকে বুঝতে পাঠককে অপেক্ষা করতে হয়েছে উপন্যাসের শেষ পর্যন্ত। তাকে ''আড়কাঠি'' হিসেবে ভাবতে পাঠকের খানিক সময় লাগে। চমকে ওঠে। এই উপন্যাসে শোষিতের অবস্থানে থাকে আর্থ-সামাজিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া গজাশিমুলের বসুশবরের বংশধররা, যারা আর্থ-সামাজিক পিরামিডে নিম্নবর্গ। ''আড়কাঠি'' রঙলালের কথা প্রসঙ্গে কুৎসিত ''আড়কাঠি''বৃত্তির কর্মপদ্ধতি তুলে ধরেছেন ঔপন্যাসিক। বাঁকুড়া, মেদিনীপুরের সীমান্ত এলাকায় যে জঙ্গল, সেই জঙ্গলের মধ্যে এই উপন্যাসের কেন্দ্রভূমি অখ্যাত গজাশিমুল গ্রাম। শিমুল গাছের প্রাধান্য হেতু এই নাম। কোনো এককালে বিহারের জঙ্গল-ডুংরি পাহাড় থেকে কোনো জমিদার বা ভুঁইহারদের অত্যাচারের ফলে জঙ্গলের পথ বেয়েই এখানে বসতি করে তুলেছিল বসুশবরদের পূর্বপুরুষেরা। তারা জঙ্গলের মানুষ। জঙ্গলের ওপরই নির্ভর করেই তাদের জীবন-যাত্রা। তারা চাষ জানে না। ফলে, জঙ্গলে শিকার করে বা ফলমূল, কন্দ-মূল জোগাড় করে বা শাল কাঠের জিনিস তৈরি করে লোকালয়ে বিক্রি করে তারা দিনপাত করে। ঠিকাদার অঘোর রায়ের হুকুমে নামমাত্র মজুরিতে চোরাই গাছ কাঠে তারা। দারিদ্র্য তাদের নিত্যসঙ্গী। জীবনে দারিদ্র্যের মধ্যেও জঙ্গলই যে তাদের শেষ আশ্রয়, তা স্পষ্ট হয় দশরথ ভক্তার কথায়- ''জঙ্গল যেদিন দয়া করেন, সেদিন পেটে খাই। যেদিন মুখ ফেরান, ঝোরার পানিতে পেট পুরিয়ে শুয়ে থাকি যেখ্যেনে সিখ্যেনে, গাছের ছায়ায়, খুলিয়ার গভ্ভরে, দিন কেইট্যে যায়, রাইত্ কেইটে যায়..., পেটের ক্ষিদা জ্বলে, নিভে, ফের জ্বলে। মোর বন্-মা'র পাশ গিয়ে আব্দার ধরি, মা-গো, পরান যায়। বাঁচাও। বন-মা সাড়া দেন। শিকার মিলে। ফল-পাকুড় মিলে। পেড়ে–ধরে খাই।''[৭৫]

দারিদ্র্যের ছিদ্র গলে কোনো এক দুর্বল মুহূর্তে গজাশিমুলে প্রবেশ করেছিল রঙলাল। বিলাতি মদ খাইয়ে গজাশিমুলের কাছের লোক হয় সে। তারপর ভুখা মানুষগুলোকে এক রূপকথার দেশের খবর শোনায়, যেখানে খাবারের অভাব নেই। সুখের আর বৈভবের সেই দেশ। তারপর সঙ্গে করে নিয়ে যায় কিছু জনকে। দাদন দিয়ে লাল খাতায় টিপছাপ নিয়ে প্রথমবার নিয়ে যায় চারজন যুবক ও গিদ্ধারি শবরের বিধবা বউকে। তার তিনমাস পরে তাদের আপনজনেদের জন্য জামা-কাপড় ও কিছু টাকা রঙলাল তুলে দেয় গজাশিমুলের লোকেদের হাতে। উল্লসিত গজাশিমুল বিশ্বাস করে রঙলালের সেই রূপকথার দেশের অস্তিত্বের কথা। রঙলালের নিখুত ফাঁদ তৈরি। গজাশিমুলের বেশিরভাগ মানুষ দাদন নিয়ে ধরা পরে সেই ফাঁদে। ঔপন্যাসিক লেখেন– "লাল খাতার বত্রিশটি পাতায় বেঁধে ফেলে পুরো গা টাকে।"[৭৬] গজাশিমুলের যুবক-যুবতিরা একে একে হারিয়ে যেতে থাকে আসামের চা-বাগানে বা অন্য কোথাও, যার খবর অন্তত গজাশিমুল জানে না। যুগ যুগ ধরে রঙলালরা মানুষ শিকার করে এসেছে। আগে যা কিছু ছিল গায়ের জোরের সঙ্গে, কর্মপদ্ধতি বদলে রঙলালরা তাইই চালিয়ে যায় ছলনায়, হুমকি দিয়ে। রঙলাল তাদের সুখের কথা লেখা পত্র সঙ্গে করে নিয়ে আসে, সুখের নাচের অস্পষ্ট ছবি দেখায়। কাউকেই চেনা যায় না, কাউকে বেশি ঢ্যাঙা লাগে, কাউকে মোটা তো কাউকে রোগা। অথচ রঙলালের সনাক্ত করানোর গুণে চলে যাওয়া মানুষদের যেন দেখে গজাশিমুল। শুধু সংশয় হয়, পড়াশোনা না জানা মানুষগুলো চিঠি লিখল কী করে! আক্ষেপ জন্মায় একবারের জন্যেও কেউ ফেরে না বলে। ঔপন্যাসিক বললেন- "প্রিয়জনদের কথা ভাবতে ভাবতে এইভাবে গড়িয়ে যায় সকাল, দুপুর, বিকেল।"[৭৭] যারা যায় তারা ফেরে না, সুখের দিনের স্বপ্নে মগ্ন হয়ে ও না ফেরার বাস্তবতাকে সঙ্গী করে যাওয়ার প্রস্তুতি নেয় রঙলালের নির্বাচিতরা। এই প্রস্তুতির সঙ্গে মিশে থাকে শিকড় ছিঁড়ে যাওয়ার এক গোপন মন কেমন করা– "ক্ষার দিয়ে কাপড়-চোপর কাচে। সাজো-মাটি

দিয়ে মাথা ঘসে নেয়। মাকড়া-পাথরের টুকরো দিয়ে মরা চাম ঘসে ঘসে ঝকঝকে করে তোলে পা। প্রিয় ফলপাকুড়টি খেয়ে নেয় আশ মিটিয়ে। জঙ্গলে নিজের প্রিয়তম জায়গাটিতে গিয়ে বারবার বসে। প্রাণের মানুষের সঙ্গে প্রাণের কথাগুলো সেরে নেয়। বড়াম পূজার থানে গিয়ে বিড়বিড় করে জীবনের গোপনতম আকাঙ্ক্ষাটি জানিয়ে আসে।"[৭৮] দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রামে হেরে যায় গজাশিমুল। জিতে যায় আড়কাঠি রঙলাল। গজাশিমুলের গর্ভ থেকে হারিয়ে যায় তার সন্তানেরা। প্রায় পনেরো বছর ধরে চলা এই প্রবাহে তাদের গানে জায়গা করে নেয় অদেখা আসাম- "দ্যাশে-ঘরে নাই কাম/চল্ বাবুয়া যাই আসাম"।[৭৯] গজাশিমুল বিশ্বাস করে বাঁচে তাদের আত্মীয়েরা না ফিরুক, তবু নেই-অভাবের সেই দেশে তারা ভালো আছে, সুখে আছে। কিন্তু সেই ভুল তাদের ভাঙে কলেজ শিক্ষক রাজীবের উদ্যোগে সুচাঁদ যখন তাদের শোচনীয় অবস্থা প্রত্যক্ষ করে আসে। আবার প্রত্যক্ষ করতে পারে না অনেককে, কারণ কিষ্টো মল্লিক, শীধর মল্লিক, কানাই দিগররা আত্মহত্যা করেছে এবং সুবাসী, রূপমতী, তারা, যশোদা, খাঁদি, টিয়া, পলাসীরা বিক্রি হয়ে গেছে কোথাও। সাবিত্রী, নিশি, চাঁপিদের দেহগুলো সন্ধ্যে হলে একাধিক লোকের খাদ্য হয়ে ওঠে। রঙলাল শুধু মজুর চালান দেওয়া আড়কাঠি নয়, সে নারী ব্যবসায়ী। তাই গজাশিমুল থেকে বেছে বেছে যুবতি মেয়েদের সে সঙ্গে করে নিয়ে যায়। যে সব যুবকদের সে সঙ্গে করে নিয়ে গেছিল তাদের অবস্থাও সঙ্গিন- "উয়ারা কোউ মানুষ নাই হে। সব জানোয়ার হয়্যেঁ গেঁইছে। উদয়াস্ত গরুর মতোন খাটালি করে। দিনান্তে আধপেটা খায়। ঝুপড়ি ঘরে শুয়ে রয় আড় রাতভর খকর্ খকর্ কাশে...আধপেটা খাবারটুকু ছাড়া ওদের মজুরী বাবদ আর সমস্ত টাকাই রঙলাল গিয়ে সরাসরি কুম্পানীর থিক্যে তুলে লেয়।"[৮০] যে ধনতান্ত্রিক পরিকাঠামোয় সস্তার মজুরের জন্য সমতল থেকে দরিদ্র মানুষদের নিয়ে যাওয়া হয়, সেখানে আসলে কোনও রূপকথার দেশ নেই। গরিবের কোনও স্বর্গরাজ্য নেই।

আড়কাঠিদের এই মানুষ শিকার চলে আসছে বহুবছর ধরেই। ঔপন্যাসিক শোনালেন কন্দর্প সরকারের ডিপুঘরের কাহিনি। ডহর স্ত্রীর ওপর নেমে আসা নির্লজ্জ অত্যাচার ও নারী চালানের গল্প। রাইপুর থানার বিরুড়ি গ্রামে গড়ে ওঠে বীরভূম থেকে আগত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দরুন এলাকার অধিকার পাওয়া কন্দর্প সরকারের ডিপুঘর। কন্দর্প সরকারের হিন্দুস্থানী সেপাইরা জঙ্গলের মধ্যে কাঠ-মধু-ফুল সংগ্রহ করতে যাওয়া মেয়েদের সুযোগ বুঝে তুলে আনত এই ডিপুঘরে এবং ক'দিন পর চালান করে দিত আসামের পথে বা অন্য কোথাও। তাদের কেউ ফিরত না। নিবিড় অন্ধকারে হারিয়ে যেত তারা। এমনই ঘটনা ঘটেছিল ডহর মাণ্ডির স্ত্রীর সঙ্গে। ডিপুঘর থেকে আগত নারীকণ্ঠের আর্ত ও আর্দ্র চিৎকারে ডহর তার স্ত্রীর অবস্থান বুঝতে পেরেও তাকে বাঁচাতে পারেনি। সেপাইদের ধামসা, মাদল ও ঝাঁঝের তীব্র আওয়াজে সে কণ্ঠস্বর চাপা পরে যায়। রাজীব ক্যাথি বার্ডকে জানায়– "এই শতাব্দীর তিন-চার দশক অবধি সারা দেশ জুড়ে চলেছে এই পদ্ধতিতে মনুষ্য-শিকার। তখন এই রাঢ়-বঙ্গে আর বিহার-মুলুকে ছিল এরকম শয়ে শয়ে ডিপুঘর, হাজারে হাজারে আড়কাঠি। তারা লাখে লাখে মানুষকে ধরে ধরে চালান করেছে চা-বাগিচায়। তাদের মধ্যে শতকরা নব্বুই ভাগই আর ফেরেনি। এখন অবশ্য দিন-কাল বদলেছে অনেকখানি, আড়কাঠিরাও বদলে ফেলেছে তাদের কর্মপদ্ধতি।"[৮১] এই বদলে যাওয়া কর্মপদ্ধতিরই খবর দিয়েছেন ঔপন্যাসিক এই উপন্যাসে। বলা বাহুল্য, যে মানুষগুলোর ওপর নেমে আসত এই আঘাত, তারা আর্থ-সামাজিক দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়া, আদিবাসী বা প্রান্তজন।

গজাশিমুল গ্রাম যখন একে একে বাঁধা পড়ছে রঙলালের লাল খাতার গেঁড়োয় তখনই আকস্মিকভাবে সেখানে প্রবেশ ঘটে লোকসংস্কৃতিপ্রেমী কলেজ শিক্ষক রাজীবের। তার ছাত্র সুনীলের বন্ধু সুচাঁদ ভক্তা গজাশিমুলের বাসিন্দা। সেই সূত্রেই বসুশবরদের সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হতে রাজীবের সেখানে

যাওয়া। সাংস্কৃতিক প্রান্তিকতার শিকার এই আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ একথা বিশ্বাস করেনি। তারা পুলিশ বা ঠিকাদারের মতো অন্য অনাদিবাসী মানুষদেরও বিশ্বাস করে না। কারণ তাদের সহজ বুদ্ধিতে এই মানুষগুলোর কার্যকলাপ বোধগম্য হয় না। শুধু তাই নয়, আদিবাসী মানুষদের ওপর অনাদিবাসী উচ্চবর্গীয় মানুষদের শোষণের দীর্ঘ ইতিহাস এই বিশ্বাসের পথে অন্তরায়। তবু একটা সময় তারা রাজীবকে বিশ্বাস করে। লোধাশবরদের মধ্যে যে শীতলা পূজার উল্লেখ *তস্কর* উপন্যাসে পাই, এখানেও রয়েছে তার কথা ও আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠানের উল্লেখ। তিনরাত জেগে পূজার্চনায় তারা তিনটি পালা করে- শীতলা-বন্দনা, শিকার নাচ ও চাঙ নাচ। "চাঙ" চামড়া দিয়ে আবৃত একধরনের লোকবাদ্যযন্ত্র। এই বাদ্যযন্ত্র নিয়ে যে নাচ, তাইই চাঙ নাচ। বৃত্তাকারে বা অর্ধচন্দ্রাকারে গান গাইতে গাইতে এই নৃত্য পরিবেশিত হয়। "এই নৃত্যের আনুষঙ্গিক বাদ্যযন্ত্র হল ঝুমকা, ঘুঙুর; বর্তমানে কেউ কেউ হারমোনিয়াম ব্যবহার করে। চাং নাচের বিশেষত্ব হল এটি সঙ্গীত আশ্রিত নৃত্য।"[৮২] সাংস্কৃতিক ঐশ্বর্য নিয়েও এরা সাংস্কৃতিক প্রান্তিকতার শিকার। তার কারণ অবশ্যই নিজেদের সাংস্কৃতিক ঐশ্বর্য সম্পর্কে অসচেতনতা। তাই রাজীবের এই নাচ-গানকে সর্বসমক্ষে আনার প্রস্তাবে তারা অবাক হয়, "বসু শবরের ছা' যাবেক শহরে লাচ করতে! কুনোদিন অমন কথা শুনেছে কোউ?"[৮৩]

রাজীবের উদ্যোগে শেষপর্যন্ত গজাশিমুলের বাসিন্দারা রাজি হয় এবং বাঁকুড়া শহরের অনুষ্ঠানের সাফল্যের পর বিভিন্ন জায়গা থেকে অনুষ্ঠানের যে আহ্বান আসে তাকে তারা উপেক্ষা করতে পারে না। এর কারণ অবশ্যই এটা যে, এইসব অনুষ্ঠান তাদের যেমন আর্থিক স্বচ্ছলতায় নিয়ে যাচ্ছিল, তেমনই ছিল খ্যাতির মোহ। রঙলাল বিপদ বুঝেছিল, দেখেছিল আধপেটা খেয়ে বাঁচা মানুষগুলোর বাড়িতে ঢুকে পড়েছে পাটালি। হাতে পয়সা এলে কেউ দাদন নেবে না, রঙলালের সঙ্গে চলে যাবে না আসামের উদ্দেশ্যে। আড়কাঠি রঙলাল বুঝেছিল এই মানুষগুলো গরীব থাকলেই তার লাভ। তাই

রাজীবের বিরুদ্ধে প্রচারে নেমেছিল, গজাশিমুলের মেয়েদের সম্মানের প্রশ্ন তুলে গ্রামের বয়স্কদের প্ররোচিত করেছিল এই ধরনের অনুষ্ঠান বন্ধ করে দিতে। কিন্তু রঙলালের নারী ব্যবসার বিষয়টি এবং আসামের নারকীয় জীবনের কথা প্রকাশ্যে আসতেই গজাশিমুলের মানুষ রাজীবের ওপর বেশি করে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। রাজীবের সঙ্গে হাত মেলায় "ইস্ট ওয়েস্ট ফোক ফাউণ্ডেশন", যার সঙ্গে যুক্ত ক্যাথি বার্ড। এই ফোক ফাউণ্ডেশনের উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে যায় একটা ছোট্ট ঘটনায়- "আবার চাটাইয়ের ওপর গাদাগাদি বিছানাপত্তর বাসন-কোসন, ছাগল-মুরগী এবং মানুষ। চাটাইয়ের সামনে এক উলঙ্গ বাচ্চার সঙ্গে একটি পাতিহাঁস এক এনামেলের থালা থেকে খাবার খুঁটে খাচ্ছে। দেখেই ক্যামেরা বাগিয়ে ধরল মিস্ বার্ড। পুরো সংসারটাকে পেছনে নিয়ে বাচ্চা ও হাঁসের ছবিখানা পলকের মধ্যে ধরে নিল ক্যামেরায়। উচ্ছ্বসিত গলায় বলল, 'এবারের 'দ্য ফোক' পত্রিকার কভারখানাই হবে এই ছবিখানা দিয়ে দারুণ হবে, না? দারুণ !"[৮৪] ভারতের দারিদ্র্যের কী নির্লজ্জ বিজ্ঞাপন, রপ্তানি ও লাভ !

"ফোক ফাউণ্ডেশনের" সুনজর গজাশিমুলের ব্রাত্য সংস্কৃতির ওপর পড়ায় দ্রুত উন্নতির শিখরে উত্তরণ ঘটতে থাকে রাজীবের, বিদেশে সেমিনার, "ব্লু বার্ড" পাবলিকেশনের জন্য বসুশবর কালচারের ওপর বই লিখে পনেরো হাজার টাকা উপার্জন ইত্যাদি। কিন্তু এগুলো ধরে রাখতে গেলে সংস্কৃতির ব্যবসাদারদের কাছে নিত্য নতুন সাংস্কৃতিক পণ্য তুলে দিতে হবে। তাই "জলকেলি নাচ" দেখানো নিয়ে মরিয়া হয়ে ওঠে রাজীব। যা ছিল বসুশবরদের নিতান্ত গোপন উপাসনা, তাকে বিশ্ববাজারে সাংস্কৃতিক ভোগের সামগ্রী করে তুলতে চায় সে। মহাশ্বেতা দেবীর লেখায় পাই– "আর লোধাশবরের সেদিনের সমাজে স্থান উঁচুতে ছিল বোঝা যায়, কানাইসর পাহাড়ে (১৯৮২ অবধি) লোধা পূজারি উপরে বসতেন, তাঁর নিচে ব্রাহ্মণ।"[৮৫] লোধারা নিজেদের বসুশবরের বংশোদ্ভূত বলে দাবি করে। এই কানাইশর পাহাড়ের ওপরেই বসুশবরদের কানাইজীউ-এর থান। ঝাড়গ্রাম জেলার বেলপাহাড়ির

দক্ষিণে এই কানাইশর পাহাড় বলে ঔপন্যাসিক উল্লেখ করেছেন, পুজো সম্পর্কে বলেছেন– "আষাঢ়ের তৃতীয় শনিবার, বছরের এই একটা দিন, খুব জমজমাট করে কানাইশর জীউর পুজো হয়। যে যার মানত শোধ করে। অসংখ্য শবর, খেড়িয়া, লোধা, বসু-শবর, বহু দিগ্‌দারী সয়ে হাজির হয় কানাইশর জীউর থানে। বহু মানুষের মনস্কামনা পূরণ করেছেন তিনি।"[৮৬] এই পুজোয় মেয়েদের অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ। মেয়েদের পূজাপদ্ধতি ভিন্ন, ভিন্নসময়ে ভিন্ন থানে। মেয়েদের এই পূজাপদ্ধতির সঙ্গে যুক্ত কানাইশর বা কানাই শবর দেবতাকেন্দ্রিক লোককথা, যার সঙ্গে মিলে যায় শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা পর্বের গোপিনীদের বস্ত্রহরণ কাহিনি। বসুশবররা বিশ্বাস করে ব্রজের কানাই একবার জন্ম নিয়েছিল সুবর্ণরেখা নদীর পাশে তাদের মূলবসত তামাজোড় গ্রামে। সেই সুবর্ণরেখায় শবরকন্যাদের স্নানের সময় তাদের বসন চুরি করে মহুয়াগাছে লুকিয়ে থাকে কানাই। ধরা পরার পর তাকে মেরে গ্রাম থেকে বের করে দেওয়া হয়। এই অপরাধে সে গ্রামে খরা লাগে। খরার অভিশাপ থেকে নিষ্কৃতির পথও বাতলে দেন তিনি। স্বপ্নে তাকে পূজা করার ও মেয়েদের জলকেলি করে পূজার আদেশ দেন। বসুশবরদের জলকেলি নাচের এটাই উৎস কাহিনি। এই নাচের বিশেষত্ব হল- "আষাঢ় মাসের তৃতীয় শনিবার গহীনরাতে খরসতিয়া লদীর পাড়ে হরেক উপচারে ব্রজরাজের পূজা হয়। পূজান্তে সব পুরুষ চলে আসে ওখান থেকে। লদীর পাড়ে থাকে শুধু যুবতী মেয়েরা। উয়ারা তখন লাচতে শুরু করে ব্রজরাজের সুমুখে। লাচতে লাচতে শরীরের এক একটি বস্ত্র তিয়াগ করতে থাকে। এক সময় পুরোপুরি উদোম হয়ে যায়। ঐ অবস্থায় উয়ারা হরেক মুদ্রায় লাচে এবং গান গায়।"[৮৭]

এই "জলকেলি নাচ" দেখে রাজীবের অনুমান করে নিতে অসুবিধা হয়নি বিশ্ববাজারে এর চাহিদার পরিমাণটা। সুন্দরী ও যৌবনবতী রঙী যে এই নাচের জন্য সর্বোত্তম তাও সে বুঝেছিল। ফলে রঙীকে যখন তার বাবা ঝাড়েশ্বর কোটাল আসামে পাঠাবে বলে দাদন নেয় রঙলালের কাছে, তখন প্রায় চার

হাজার ছশো টাকায় সে রঙলালের কাছ থেকে রঙীর মুক্তি কিনে নেয়। রঙী রঙলালের কাছে যতটা মূল্যবান, রাজীবের কাছেও ততটাই, কারণ তার শারীরিক সৌন্দর্য বাজারে বিক্রি হবে বেশি টাকায়। এখানে রঙলালের সঙ্গে রাজীবের কোনও পার্থক্য নেই। শুধু সংস্কৃতির চর্চা নয়, দীর্ঘদিন ধরে গজাশিমুলের নাচের দলের সঙ্গে আর্থিক বঞ্চনা করা রাজীব "জলকেলি নাচ" বিক্রি করে উচ্চবিত্তদের যৌন বিলাসিতায়, অর্থ নিয়ে দরদামে বিরক্ত রাজীবের মুখে ঔপন্যাসিক শোনান আড়কাঠির কণ্ঠস্বর– "রাজীব তরল গলায় বলে, 'এ দলে জনা বারো মেয়ে আছে। সবগুলোই এক একটি জুয়েল। তার মধ্যে একটা ডব্‌কা ছুঁড়ি আছে, দেখেছেন তো? ওকে দেখলে আপনার বড়বাজারের চোখ ট্যারা হয়ে যাবে মশাই। ওর এক-একখানা বুকই আঠারো হাজারে বিকোবে।"[৮৮] রাজীব সম্পূর্ণ অর্থেই আড়কাঠি হয়ে ওঠে। বিদেশের বাজারে বিক্রি হয় রঙীর উদোম শরীরের ছবি। "আনন্দম্" সংস্থার সেক্রেটারি বাজোরিয়ার সঙ্গে দরাদরির সবটাই শুনে ফেলে সুচাঁদ ভক্তা। রঙলাল তাদের আপনজন ছিল না, কিন্তু রাজীবের আপনার হয়েও সংস্কৃতির নামে তাদের নিয়ে ব্যবসা করা তারা মেনে নিতে পারেনি। ওরা ফিরে গেছিল স্বপ্নভঙ্গের বেদনা নিয়ে। হয়তো আবার রঙলালের কাছে ধরা দেবে। আড়কাঠিদের হাত থেকে যে এই নিম্নবর্গের মানুষদের নিষ্কৃতি নেই, ঔপন্যাসিক এটাই শেষ পর্যন্ত বোঝাতে চেয়েছেন; কারণ আড়কাঠিরা বারবার সময় অনুযায়ী তাদের কর্মপদ্ধতি পাল্টেছে, পাল্টাচ্ছে। নিম্নবর্গের শোষণই শুধু নয়, রাজীবের মধ্যে দিয়ে তাদের প্রতি মানসিকতার পরিচয়ও ঔপন্যাসিক দক্ষতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন।

মহাশ্বেতা দেবী তাঁর *ভারতের দরিদ্রদের কল্যাণ সমিতিগুলিকে সরাসরি উন্নয়নের ভার দেওয়া হোক* প্রবন্ধে লিখছেন "মেদিনীপুরের লোধা ও পুরুলিয়ার খেড়িয়াদের একসময় অপরাধপ্রবণ আদিবাসী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল পরে যদিও তা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। কিন্তু এখনও সমাজ,

প্রশাসন ও পুলিশের চোখে এরা অপরাধী।...সরকারের ঘোষিত অরণ্য নীতির সঙ্গে এর বেশ মিল দেখা যায়। অরণ্য সম্পদ বিলুপ্ত হওয়ার জন্য যে হাত কুঠারাঘাত করে তাকে দায়ী করা যায় না। কাঠের ব্যবসাদার ও বনবিভাগের কন্টাক্টররা প্রায়শই বনবিভাগের কর্মীদের সঙ্গে যোগসাজসে জঙ্গল তছনছ করে ও কাঠ ও অন্যান্য জিনিস চোরাচালান দেয়।"[৮৯] লোধারা মূলত অরণ্যজীবী। জঙ্গলকে তারা মা বলেই মানে। *ব্যাধখণ্ডে* (১৯৯৪) পাই "অভয়াচণ্ডী তোমাদের দিয়েছে পুজো, পুঁথি, হামার, গোহাল! আমাদের দিয়েছে জঙ্গল। আমরা শবর হে, জঙ্গলের সন্তান!"[৯০] আবার *শবরচরিত (প্রথমপর্ব)*-তে পাই "...পরক্ষণে ভাবল, আরে ধুস, জঙ্গল হল মা! তাবৎ লোধামানুষ তো তার ছা–ছানা। সেই জঙ্গল- মায়ের রাজত্বে চরাচর সুখে আছে, সর্বলোক কুশলে আছে, কারো কোনো বিঘ্ন নেই!"[৯১] অথচ এই অরণ্যের ওপর অধিকার চলে যেতেই তারা জীবিকাহীন হয়ে পড়ল। *ব্যাধখণ্ডে* দেখি ফুলি কাঠ, মধু, ধুনো, ফল বিক্রি করে সংসার চালায়। চাষ তারা করে না। চাষ করতে না পারার সঙ্গে জড়িয়ে প্রচলিত লোককথায় জানা যায়, চাষের কাজ শেখানোর জন্য লোধাদের হাল-বলদ দিয়েছিলেন ভগবান শিব। বললেন জঙ্গল কেটে চাষের জমি তৈরি করতে। জঙ্গল কাটতে কাটতে ক্লান্ত ক্ষুধার্ত মানুষগুলো কিছু না পেয়ে হালের বলদকেই কেটে খেয়ে ফেলেছিল, সেই রাগে শিব অভিশাপ দিয়েছিলেন যে তারা কোনওদিনই চাষ করতে পারবে না।[৯২] তাই জঙ্গলই লোধা-শবরদের একমাত্র আশ্রয়। নগরের আগ্রাসনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের আশ্রয় হারিয়েছে। আরও গভীর অন্য জঙ্গলের খোঁজে চলে গেছে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে- "যেখানে অরণ্য, সেখানে শবর।"[৯৩] নগরের হাওয়াকে শবরদের বড় ভয়। *ব্যাধখণ্ডে*র কাল্যা উপলব্ধি করে নগরের আগ্রাসনে বিপন্ন হতে চলেছে তাদের অস্তিত্ব, সংস্কৃতি। তাই ফুলি যেদিন তাকে ব্রাহ্মণ্যসংস্কৃতির প্রভাবে "তুই"-এর বদলে "তুমি" বলে সম্ভাষণ করে, কাল্যা চমকে ওঠে। আরড়া নগর। সেই নগরের প্রান্তে জঙ্গলের কোলে তাদের বাস।

ক্রমাগত সেই নগর বেড়েছে। বিভিন্ন জাতের মানুষ এসেছে। বসতি তুলেছে। ভয় পেয়েছে কাল্যা ও তার মা তেজটা। মুকুন্দের ব্রাহ্মণ্য ছায়া এড়িয়ে চলতে চেয়েছে সে। অবশ্য শবরদের এই ব্রাহ্মণ বিদ্বেষের অন্য কারণও আছে। একটি কাহিনি থেকে জানা যায় প্রাচীনকালের কোনো এক সময়ে গভীর আদিগন্ত বিস্তৃত অরণ্যে বাস করত শবররা। সেই অরণ্যের বাইরে নগরে রাজত্ব করতেন রাজা। সেই রাজার ইচ্ছে হল যে তিনি অভয়ার মন্দির স্থাপন করবেন। কিন্তু দেবী মূর্তি নিয়ে ধন্দে থাকা রাজা একদিন জানতে পারেন জঙ্গলের মধ্যে বসবাসকারী শবররা অভয়ার পুজো করেন। দেবী মূর্তি এনে দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয় এক ব্রাহ্মণকুমার সাতকাহন ধনের বিনিময়ে। রাজার অনুমতি নিয়ে সে শবর পূজারির আশ্রয় গ্রহণ করে। সেখানেই সে দেখে শিলাপটে দেবী অভয়া পূজিতা। শিলাপটটি সে চুরি করে রাজার কাছে দেয়। দেবীর অভিশাপে সেই ব্রাহ্মণকুমার নির্বংশ হয়। দেবীও পট ছেড়ে চলে যান এবং দেবীর অভিশাপেই নির্ধারিত হয় যে শবররা ব্রাহ্মণকে মানবে না, প্রণাম করবে না।[৯৪] অন্য আরেকটি কাহিনি হল ‘‘ললিতা পালা’’ বা ‘‘ললিতা শবর পালা’’। লোধাশবর সম্প্রদায়ের প্রধান ছিলেন বসুশ্রবা বা বসুশবর। তাঁর পূজিত ছিলেন কালিয়া দেবতা নীলমাধব। পুরীর রাজা ইন্দ্রদুম্নের ইচ্ছেতে ও আদেশে ব্রাহ্মণ যুবক বিদ্যা (মতান্তরে বিদ্যাপতি) গিয়েছিল বসুশবরের পূজিত নীলমাধবকে চুরি করতে। বসুশবরের যুবতি কন্যা ললিতাকে বিবাহ করে সে বসুশবরের ঘরে আশ্রয় নেয়। একদিন ললিতার সাহায্যে নীলমাধবকে চুরি করে ললিতাকে নিয়েই ঘর ছাড়ে বিদ্যা। লোধারা মনে করে পুরীর জগন্নাথ লোধাদের সেই নীলমাধব। তারা বিশ্বাস করে ললিতা-বিদ্যার উত্তরসূরিরাই পুরীর রথ টানে। তাদের স্পর্শ ভিন্ন জগন্নাথ দেবের রথ চলে না। তবু তাদের দেবতাকে চুরি করেছিল ব্রাহ্মণসন্তান, শবরদের বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে। তাই তারা ব্রাহ্মণদের মান্যতা দেয় না।[৯৫] এই লোধারা নিজেদের ‘‘জরা ব্যাধে’’র বংশধর বলে পরিচয় দেয়, যে জরাব্যাধের

শরে দেহত্যাগ করেছিলেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। মহাভারতের "মুষলপর্বে" এই জরাব্যাধের কাহিনি আছে। শ্রীকৃষ্ণ যখন গাছের ডালে বসে গভীর চিন্তায় মগ্ন, সেইসময় তাঁর ঝুলন্ত লালবর্ণ পদ্মের মতো চরণদ্বয়কে "মৃগকর্ণ" বলে ভুল করে বাণ নিক্ষেপ করে জরা ব্যাধ-

" টানিয়া ধনুকখান সন্ধানিয়া মারে বাণ

চরণ ভেদিল জগন্নাথে।।"[৯৬]

নাগরিক আগ্রাসনের ফলে ক্রমেই অরণ্য ছোটো হয়ে যায়। সরকারি অরণ্যনীতির ফলে অরণ্যে গাছ কাঠা, শিকার প্রভৃতি বন্ধ হয়ে যায় লোধাদের এবং অরণ্যকেন্দ্রিক এই মানুষদের অস্তিত্ব সংকটে পড়ে। নলিনী বেরার *শবরচরিত (প্রথম পর্ব)* উপন্যাসে দেখি বনের গার্ড "নরসিঙাগাড়"-এর ভয়ে তটস্থ লোধাপাড়া। "নরসিঙা" শব্দটি "নৃসিংহ" শব্দের উচ্চারণভ্রংশ এবং "গাড়" গার্ডের। নৃসিংহ মাহাত বনের রক্ষী। জঙ্গলে তার ভয়েই লোধারা কাঠ বা কন্দমূল আনতে যেতে ভয় পায়। লোধারা অভিযোগ করে রাইবুর কাছে। যে অরণ্যে অধিকার ছিল তার আরণ্যক সন্তানদের, সেই সন্তানদের প্রতি এই শব্দবন্ধের প্রয়োগ ব্যঙ্গের মতো শোনায়- "তোর বাপের বন রে গুড়গুড়িয়া যে কাটছিস?"[৯৭] ঔপন্যাসিক বুঝি খানিক সচেতনভাবেই উক্ত শব্দ নৃসিংহ মাহাতোর মুখে বসিয়েছিলেন। ব্রিটিশ আমলের এক আইনের জেরে জন্মগত অপরাধী বলে চিহ্নিত হয়ে যাওয়া লোধাদের সম্পর্কে স্বাধীন ভারতে সেই আইন বিলোপের পরেও ধারণার পরিবর্তন ঘটে না। রাষ্ট্রযন্ত্রের অংশ হয়েই পুলিশও যে কোনো অপরাধে লোধা পুরুষদেরই তুলে নিয়ে যায়। পুলিশের গাড়ির আওয়াজ তাদের পরিচিত। লোধা পুরুষরা শারীরিক নির্যাতনের ভয়ে জঙ্গলে পালিয়ে যায়, লোধানিরা হয় যৌননিগ্রহের শিকার। *শবর-চরিত*-এ এই নির্যাতনের ছবি আঁকলেন ঔপন্যাসিক এইভাবে- "...বলতে বলতে দারোগা শিশুবালাকে বুকের ভিতর জাপটে ধরে ধস্তাধস্তি শুরু করল, একসময় নাজেহাল হ'য়ে বলল, ইডিয়েট

বুঝিস না আমার ঔরসে তোর পেটে লোধাবাচ্চা হবে না, হবে বামুনবাচ্চা, এসব ভেবেও তোর সুখ হচ্ছে না, সুখ?"[৯৮] নির্লজ্জ উচ্চবর্ণীয় ঔদ্ধত্যে আদিবাসী নারী বারবার এমন যৌননির্যাতনের শিকার হয়েছে, হয়ে এসেছে। আর্থ-সামাজিক বিন্যাসে লোধারা অনেকটাই পেছনে অবস্থান করে বিশেষত "অপরাধপ্রবণ জাতি" হিসেবে চিহ্নিত হওয়া ও চাষ করতে না পারার দরুন। আদিবাসী সাঁওতাল বা অন্যান্যরা অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিন্যাসে লোধাদের থেকে এগিয়ে আছে বলে *শবরচরিত (প্রথম পর্ব)* লোধাদের বিচারসভা বসে দিল্লীশ্বর মাহাতোর উঠোনে। সভায় উপস্থিত থাকে দশরথ মাহাতো, পঞ্চানন বেরা, রামচন্দ্র রানা, পিতাম হাঁসদা। ফলে, বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গ নির্মাণের পেছনে কাজ করে অর্থ, সমাজ, জাতি, শ্রেণির মতো কিছু অবস্থান। লোধারা নিজেরাও শ্রেণিসচেতন নয়, নিজ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য যথেষ্ট সক্রিয় নয়, নলিনী বেরা লোধানি ফুলটুসির মধ্যে খানিক সচেতনতা দেখিয়েছেন। নিজে অশিক্ষিত হয়েও সে মেয়ে নুকুকে স্কুলে পড়াতে বদ্ধপরিকর। স্বামী ভুবন লোধার "আমাদের জাইতে উ-সব ফের হয় নাকি?"[৯৯]র উদাসীনতার বাধা অতিক্রম করে সে অন্তত ভাবতে পেরেছিল চুরি ছাড়াও তাদের ছেলে মেয়ের সামনে থাকবে কোনো উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। তাই নুকুকে ঘুমে ঢুলতে দেখে রাগে হতাশায় ফুলটুসি বলে- "চোর লদ্ধার ছানা চোর ছাড়া-বা কী হবে! বলতে বলতে নুকুকে মারধোর শুরু করল লোধানী।"[১০০]

মল্লিকা সেনগুপ্ত তাঁর *সীতায়ন* (১৯৯৬) উপন্যাসে রামায়নের কাহিনিকে দেখেছেন অন্যভাবে, সীতার ওপর রঘুকুলপতি রামের করা অন্যায়ই এখানে স্পষ্ট। ক্ষাত্রধর্ম, রাজধর্ম রক্ষার জন্য তিনি সীতাকে ত্যাগ করেছিলেন, রাবণের হাত থেকে সীতার উদ্ধার ছিল আসলে তার নিজ বীরত্বের মর্যাদা রক্ষার জন্য নেওয়া পদক্ষেপ, সেই ক্ষত্রিয়ের দম্ভ প্রকাশিত শম্বুক হত্যায়। সীতা নিজের অপহরণের কারণ ব্যাখ্যা করেছেন এইভাবে- "কৌশল্যানন্দন যদি আমাদের যৌথ বনবাসজীবনে বারংবার অনার্যদের

পীড়ন না করতেন, যদি তুমি শূর্পণখার নাসিকা কর্তন না করতে, যদি তিনি সহস্র রাক্ষস বধ না করতেন, যদি তিনি অন্ধ আর্যগর্বে আদিভূমির বাসিন্দাদের হিংসা না করতেন, রাবণ প্রতিশোধ নিতে আসত না।"[১০১] সীতা দেখেছেন অনার্য অরণ্যচারী মানুষদের কাছে আর্যদের অস্তিত্বই ছিল তাদের অস্তিত্বের পরিপন্থী। বনের মধ্যে আর্য ঋষিদের আশ্রম তাদের বনের খাদ্যভাণ্ডারের উৎস কমিয়ে দেয়। ফলে, তারা আক্রমণ করে খাদ্যের প্রতিদ্বন্দ্বী আশ্রম এবং আশ্রম রক্ষা করতে ক্ষত্রিয় আর্য হত্যা করে অনার্যদের। শম্বুকের প্রসঙ্গকে বিস্তৃতভাবে উপন্যাসে তুলে ধরার মধ্যে দিয়ে ঔপন্যাসিক অনার্যের অপর আর্যের কর্তৃত্বের ষড়যন্ত্রকে তুলে ধরেছেন। সেই ষড়যন্ত্র শূদ্রায়ণ। উপন্যাসে "জন" শব্দের প্রয়োগ একাধিকবার পাই। শম্বুকদের সম্প্রদায় এখানে "জন" নামে উল্লিখিত। N. K. Bose বলছেন – "This contact goes back, at least, to the days of the *Ramayana* and the *Mahabharata;* for in them there are references to tribal communities who are referred to as *Jana.*"[১০২] আর্যদের আক্রমণের হাত থেকে মুক্তি পেতে এই "জন"-এর কাছে যে প্রস্তাব গেছিল, তাই শূদ্রায়ণ। আর্য বর্ণব্যবস্থায় এই পরাক্রমী অনার্যদের অন্তর্ভুক্ত করে আসলে সবার সেবার "দাস"-এ পরিণত করা হয়েছিল- "গত ন'বছরে শম্বুক ও তার জনের লোকেরা ক্রমশ তাদের মুক্ত কিন্তু ত্রাসতাড়িত জীবন ছেড়ে নিরাপদ শৃঙ্খলিত শূদ্রজীবন বিধিতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। পুরনো শিলাময় উপদেবতার বদলে তারা বৈদিক দেবতাদের বশীভূত হয়েছে।"[১০৩] যে ব্রাহ্মণ্যবাদ শম্বুককে শূদ্র করতে চেয়েছে, উপন্যাসে দেখি সেই ব্রাহ্মণ্যবাদ বা বর্ণবাদই শম্বুকের হত্যা করেছে। মল্লিকা সেনগুপ্ত ভারতে দীর্ঘদিন ধরে অনার্যদের ওপর শোষণ ও অত্যাচারের বাস্তবতাকে অনবদ্যভাবে তুলে এনেছেন এবং মহাশ্বেতা দেবী মূলস্রোতীদের দীর্ঘদিনের অপরাধের প্রতিবাদ করেছেন সারাজীবনব্যাপী আদিবাসী কল্যাণমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত থেকে।

**তথ্যসূত্র :**

১। পার্থ চট্টোপাধ্যায়, "ভূমিকা : নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চার ইতিহাস", *নিম্নবর্গের ইতিহাস,* গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি, কলকাতা, সপ্তম মুদ্রণ, নভেম্বর ২০১২, পৃষ্ঠা- ৩

২। পার্থ চট্টোপাধ্যায়, "ভূমিকা : নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চার ইতিহাস", *নিম্নবর্গের ইতিহাস,* গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি, কলকাতা, সপ্তম মুদ্রণ, নভেম্বর ২০১২, পৃষ্ঠা- ৩

৩। রণজিৎ গুহ, "নিম্নবর্গের ইতিহাস", *নিম্নবর্গের ইতিহাস,* গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি, কলকাতা, সপ্তম মুদ্রণ, নভেম্বর ২০১২, পৃষ্ঠা- ৩৩

৪। জহর সেনমজুমদার, *নিম্নবর্গের বিশ্বায়ন,* পুস্তক বিপণি, কলকাতা, এপ্রিল, ২০১৭, পৃষ্ঠা- ১৫-১৬

৫। জহর সেনমজুমদার, *নিম্নবর্গের বিশ্বায়ন,* পুস্তক বিপণি, কলকাতা, এপ্রিল, ২০১৭, পৃষ্ঠা- ২৩

৬। ড. কমলকুমার সিংহ, "সনাতন ও প্রগতিশীল বনাম দলিত সাহিত্য", *দলিত সাহিত্য,* নীতীশ বিশ্বাস সম্পাদিত, ঐক্যতান গবেষণা সংসদ, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ ২০০২, পৃষ্ঠা- ১০২

৭। মহাশ্বেতা দেবী, *কবি বন্দ্যঘটী গাঞিঁর জীবন ও মৃত্যু,* করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, আশ্বিন ১৪১০, পৃষ্ঠা- ৪২

৮। সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদনা), *মনুসংহিতা,* আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি, কলকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ, অক্টোবর ২০১৩, পৃষ্ঠা- ৩১৫

৯। কাশীরাম দাস, *মহাভারত, ১ম খণ্ড,* বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, ডিসেম্বর ২০১৪, পৃষ্ঠা- ১১৭

১০। মহাশ্বেতা দেবী, "লেখকের কথা", *কবি বন্দ্যঘটী গাঞিঞর জীবন ও মৃত্যু,* করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, আশ্বিন ১৪১০, পৃষ্ঠা- vi

১১। মহাশ্বেতা দেবী, *কবি বন্দ্যঘটী গাঞিঞর জীবন ও মৃত্যু,* করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, আশ্বিন ১৪১০, পৃষ্ঠা- ৩০

১২। মহাশ্বেতা দেবী, *কবি বন্দ্যঘটী গাঞিঞর জীবন ও মৃত্যু,* করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, আশ্বিন ১৪১০, পৃষ্ঠা- ১১৪

১৩। মহাশ্বেতা দেবী, *কবি বন্দ্যঘটী গাঞিঞর জীবন ও মৃত্যু,* করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, আশ্বিন ১৪১০, পৃষ্ঠা- ২০

১৪। মহাশ্বেতা দেবী, *কবি বন্দ্যঘটী গাঞিঞর জীবন ও মৃত্যু,* করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, আশ্বিন ১৪১০, পৃষ্ঠা- ৩৭

১৫। মহাশ্বেতা দেবী, *কবি বন্দ্যঘটী গাঞিঞর জীবন ও মৃত্যু,* করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, আশ্বিন ১৪১০, পৃষ্ঠা- ১০৬

১৬। মহাশ্বেতা দেবী, *কবি বন্দ্যঘটী গাঞিঞর জীবন ও মৃত্যু,* করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, আশ্বিন ১৪১০, পৃষ্ঠা- ১৪৪

১৭। মহাশ্বেতা দেবী, *কবি বন্দ্যঘটী গাঞিঞর জীবন ও মৃত্যু,* করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, আশ্বিন ১৪১০, পৃষ্ঠা- ১৪৯

১৮। মহাশ্বেতা দেবী, *কবি বন্দ্যঘটী গাঞিঞর জীবন ও মৃত্যু,* করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, আশ্বিন ১৪১০, পৃষ্ঠা- ১৬৫

১৯। পার্থ চট্টোপাধ্যায়, "ভূমিকা : নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চার ইতিহাস", *নিম্নবর্গের ইতিহাস,* গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি, কলকাতা, সপ্তম মুদ্রণ, নভেম্বর ২০১২, পৃষ্ঠা- ২০

২০। প্রফুল্ল রায়, *আকাশের নীচে মানুষ,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, মার্চ ২০১৭, পৃষ্ঠা- ২২

২১। প্রফুল্ল রায়, *আকাশের নীচে মানুষ,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, মার্চ ২০১৭, পৃষ্ঠা- ৩৪

২২। প্রফুল্ল রায়, *আকাশের নীচে মানুষ,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, মার্চ ২০১৭, পৃষ্ঠা- ২১৬

২৩। প্রফুল্ল রায়, *আকাশের নীচে মানুষ,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, মার্চ ২০১৭, পৃষ্ঠা- ৪৭

২৪। প্রফুল্ল রায়, *আকাশের নীচে মানুষ,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, মার্চ ২০১৭, পৃষ্ঠা- ৮৮

২৫। প্রফুল্ল রায়, *আকাশের নীচে মানুষ,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, মার্চ ২০১৭, পৃষ্ঠা- ১০০

২৬। প্রফুল্ল রায়, *আকাশের নীচে মানুষ,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, মার্চ ২০১৭, পৃষ্ঠা- ১৭৮

২৭। *সংসদ বাংলা অভিধান,* সাহিত্য সংসদ, মার্চ ২০১৩, পৃষ্ঠা- ৮৭

২৮। প্রফুল্ল রায়, *আকাশের নীচে মানুষ,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, মার্চ ২০১৭, পৃষ্ঠা- ৬৯

২৯। বুদ্ধদেব গুহ, *কোজাগর,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, সপ্তচত্বারিংশ সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৭, পৃষ্ঠা- ৩৬৮

৩০। বুদ্ধদেব গুহ, *কোজাগর,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, সপ্তচত্বারিংশ সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৭, পৃষ্ঠা- ৩৬৮

৩১। বুদ্ধদেব গুহ, *কোজাগর,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, সপ্তচত্বারিংশ সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৭, পৃষ্ঠা- ৩৬৭

৩২। বুদ্ধদেব গুহ, *কোজাগর,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, সপ্তচত্বারিংশ সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৭, পৃষ্ঠা- ২৮১

৩৩। বুদ্ধদেব গুহ, *কোজাগর,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা,সপ্তচত্বারিংশ সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৭, পৃষ্ঠা- ১৫

৩৪। বুদ্ধদেব গুহ, *কোজাগর,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, সপ্তচত্বারিংশ সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৭, পৃষ্ঠা- ১৫

৩৫। বুদ্ধদেব গুহ, *কোজাগর,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, সপ্তচত্বারিংশ সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৭, পৃষ্ঠা- ৩৫৫

৩৬। বুদ্ধদেব গুহ, *কোজাগর,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, সপ্তচত্বারিংশ সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৭, পৃষ্ঠা- ৩৫৬

৩৭। বুদ্ধদেব গুহ, *কোজাগর,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, সপ্তচত্বারিংশ সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৭, পৃষ্ঠা- ৩৪২

৩৮। বুদ্ধদেব গুহ, *কোজাগর,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, সপ্তচত্বারিংশ সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৭, পৃষ্ঠা- ১৫২

৩৯। বুদ্ধদেব গুহ, *কোজাগর,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, সপ্তচত্বারিংশ সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৭, পৃষ্ঠা- ১৮২

৪০। বুদ্ধদেব গুহ, *কোজাগর,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, সপ্তচত্বারিংশ সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৭, পৃষ্ঠা- ৩১৮

৪১। বুদ্ধদেব গুহ, *কোজাগর,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, সপ্তচত্বারিংশ সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৭, পৃষ্ঠা- ৩১৯

৪২। বুদ্ধদেব গুহ, *কোজাগর,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, সপ্তচত্বারিংশ সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৭, পৃষ্ঠা- ২৪৪

৪৩। বুদ্ধদেব গুহ, *কোজাগর,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, সপ্তচত্বারিংশ সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৭, পৃষ্ঠা- ২৬৬

৪৪। বুদ্ধদেব গুহ, *কোজাগর,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, সপ্তচত্বারিংশ সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৭, পৃষ্ঠা- ৩০৬

৪৫। বুদ্ধদেব গুহ, *কোজাগর,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, সপ্তচত্বারিংশ সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৭, পৃষ্ঠা- ২৭৭

৪৬। মহাশ্বেতা দেবী, "ভূমিকার পরিবর্তে", *মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র পঞ্চদশ খণ্ড,* অজয় গুপ্ত সম্পাদিত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, জুলাই ২০১৫, পৃষ্ঠা- ১০-১১

৪৭। মহাশ্বেতা দেবী, "ভূমিকার পরিবর্তে", *মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র পঞ্চদশ খণ্ড,* অজয় গুপ্ত সম্পাদিত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, জুলাই ২০১৫, পৃষ্ঠা- ১১

৪৮। ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে, *পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ, দ্বিতীয় খণ্ড,* বাস্কে পাবলিকেশন, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৬, পৃষ্ঠা- ২৫

৪৯। মহাশ্বেতা দেবী, "ভূমিকা", "টেরোড্যাকটিল, পূরণ সহায় ও পিরথা", *মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র পঞ্চদশ খণ্ড,* অজয় গুপ্ত সম্পাদিত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, জুলাই ২০১৫, পৃষ্ঠা- ২২৭

৫০। মহাশ্বেতা দেবী, "ভূমিকার পরিবর্তে", *মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র পঞ্চদশ খণ্ড,* অজয় গুপ্ত সম্পাদিত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, জুলাই ২০১৫, পৃষ্ঠা- ১১

৫১। মহাশ্বেতা দেবী, "টেরোড্যাকটিল, পূরণ সহায় ও পিরথা", *মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র পঞ্চদশ খণ্ড,* অজয় গুপ্ত সম্পাদিত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, জুলাই ২০১৫, পৃষ্ঠা-২৬৮

৫২। মহাশ্বেতা দেবী, "টেরোড্যাকটিল, পূরণ সহায় ও পিরথা", *মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র পঞ্চদশ খণ্ড,* অজয় গুপ্ত সম্পাদিত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, জুলাই ২০১৫, পৃষ্ঠা-২৩৭

৫৩। মহাশ্বেতা দেবী, "টেরোড্যাকটিল, পূরণ সহায় ও পিরথা", *মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র পঞ্চদশ খণ্ড,* অজয় গুপ্ত সম্পাদিত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, জুলাই ২০১৫, পৃষ্ঠা- ২৬৩

৫৪। মহাশ্বেতা দেবী, "টেরোড্যাকটিল, পূরণ সহায় ও পিরথা", *মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র পঞ্চদশ খণ্ড,* অজয় গুপ্ত সম্পাদিত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, জুলাই ২০১৫, পৃষ্ঠা- ২৭৩

৫৫। মহাশ্বেতা দেবী, "টেরোড্যাকটিল, পূরণ সহায় ও পিরথা", *মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র পঞ্চদশ খণ্ড,* অজয় গুপ্ত সম্পাদিত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, জুলাই ২০১৫, পৃষ্ঠা- ২৫৫

৫৬। মহাশ্বেতা দেবী, "টেরোড্যাকটিল, পূরণ সহায় ও পিরথা", *মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র পঞ্চদশ খণ্ড,* অজয় গুপ্ত সম্পাদিত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, জুলাই ২০১৫, পৃষ্ঠা- ২৭৩

৫৭। মহাশ্বেতা দেবী, "টেরোড্যাকটিল, পূরণ সহায় ও পিরথা", *মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র পঞ্চদশ খণ্ড,* অজয় গুপ্ত সম্পাদিত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, জুলাই ২০১৫, পৃষ্ঠা- ২৪৭

৫৮। মহাশ্বেতা দেবী, "ভূমিকা", "টেরোড্যাকটিল, পূরণ সহায় ও পিরথা", *মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র পঞ্চদশ খণ্ড,* অজয় গুপ্ত সম্পাদিত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, জুলাই ২০১৫, পৃষ্ঠা- ২২৮

৫৯। মহাশ্বেতা দেবী, "টেরোড্যাকটিল, পূরণ সহায় ও পিরথা", *মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র পঞ্চদশ খণ্ড,* অজয় গুপ্ত সম্পাদিত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, জুলাই ২০১৫, পৃষ্ঠা- ২৪৬

৬০। ভগীরথ মিশ্র, *তস্কর,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯২, পৃষ্ঠা- ২০-২১

৬১। ভগীরথ মিশ্র, *তস্কর,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯২, পৃষ্ঠা- ১০৫

৬২। Meena Radhakrishna, *Dishonoured by History 'Criminal Tribes' and British Colonial Policy,* Orient Longman, Hyderabad, 2001, p- 31

৬৩। ভগীরথ মিশ্র, *তস্কর,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯২, পৃষ্ঠা- ৪২-৪৩

৬৪। ভগীরথ মিশ্র, *তস্কর,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯২, পৃষ্ঠা- ৩৬

৬৫। নলিনী বেরা, *শবর চরিত, অখণ্ড সংস্করণ,* করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, নভেম্বর ২০১৭, পৃষ্ঠা-৩৮

৬৬। ভগীরথ মিশ্র, *তস্কর,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯২, পৃষ্ঠা- ৭৩

৬৭। A. R. Branmuller (ed.), *Macbeth*, Cambridge University Press, 1997, p- 146

৬৮। A. R. Branmuller (ed.), *Macbeth*, Cambridge University Press, 1997, p- 219

৬৯। ভগীরথ মিশ্র, *তস্কর,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯২, পৃষ্ঠা- ৮০

৭০। ভগীরথ মিশ্র, *তস্কর,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯২, পৃষ্ঠা- ৮৩

৭১। ভগীরথ মিশ্র, *তস্কর,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯২, পৃষ্ঠা- ৯৩

৭২। ভগীরথ মিশ্র, *তস্কর,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯২, পৃষ্ঠা- ১০৩

৭৩। ভগীরথ মিশ্র, *তস্কর,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯২, পৃষ্ঠা- ১৮৯

৭৪। ভগীরথ মিশ্র, *তস্কর,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯২, পৃষ্ঠা- ১৯৫-১৯৬

৭৫। ভগীরথ মিশ্র, *আড়কাঠি,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০৮, পৃষ্ঠা-২২

৭৬। ভগীরথ মিশ্র, *আড়কাঠি,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০৮, পৃষ্ঠা-২৪

৭৭। ভগীরথ মিশ্র, *আড়কাঠি,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০৮, পৃষ্ঠা-২৫

৭৮। ভগীরথ মিশ্র, *আড়কাঠি,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০৮, পৃষ্ঠা-২৬

৭৯। ভগীরথ মিশ্র,*আড়কাঠি,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০৮, পৃষ্ঠা–২৬

৮০। ভগীরথ মিশ্র,*আড়কাঠি,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০৮, পৃষ্ঠা-৬৯

৮১। ভগীরথ মিশ্র, *আড়কাঠি,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০৮, পৃষ্ঠা-২১

৮২। ড. বরুণকুমার চক্রবর্তী (সম্পাদনা), *বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ,* অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, কলকাতা, পরিমার্জিত সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০০৭, পৃষ্ঠা- ১৬৩

৮৩। ভগীরথ মিশ্র, *আড়কাঠি,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০৮, পৃষ্ঠা-৩৩

৮৪। ভগীরথ মিশ্র, *আড়কাঠি,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০৮, পৃষ্ঠা-৩৮

৮৫। মহাশ্বেতা দেবী, *ব্যাধখণ্ড,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৯৪, পৃষ্ঠা- ৭

৮৬। ভগীরথ মিশ্র, *আড়কাঠি,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০৮, পৃষ্ঠা- ৪৪

৮৭। ভগীরথ মিশ্র, *আড়কাঠি,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০৮, পৃষ্ঠা- ১১৮

৮৮। ভগীরথ মিশ্র, *আড়কাঠি,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০৮, পৃষ্ঠা- ১৫৮

৮৯। মহাশ্বেতা দেবী, ''ভারতের দরিদ্রদের কল্যাণ সমিতিগুলিকে সরাসরি উন্নয়নের ভার দেওয়া হোক'', *মহাশ্বেতা দেবী রচনাসমগ্র পঞ্চদশ খণ্ড,* অজয় গুপ্ত সম্পাদিত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জুলাই ২০১৫, পৃষ্ঠা- ৫১০

৯০। মহাশ্বেতা দেবী, *ব্যাধখণ্ড,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৯৪, পৃষ্ঠা- ৪৫

৯১। নলিনী বেরা, *শবর চরিত, অখণ্ড সংস্করণ,* করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, নভেম্বর ২০১৭, পৃষ্ঠা-১৮

৯২। নলিনী বেরা, *শবর চরিত, অখণ্ড সংস্করণ,* করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, নভেম্বর ২০১৭, পৃষ্ঠা- ৬৩

৯৩। মহাশ্বেতা দেবী, *ব্যাধখণ্ড,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৯৪, পৃষ্ঠা- ৫২

৯৪। মহাশ্বেতা দেবী, *ব্যাধখণ্ড,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৯৪, পৃষ্ঠা- ৫৭

৯৫। নলিনী বেরা, *শবর চরিত, অখণ্ড সংস্করণ,* করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, নভেম্বর ২০১৭, পৃষ্ঠা- ৭৮

৯৬। কাশীরাম দাস, *মহাভারত, দ্বিতীয় খণ্ড,* কবি নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য সংশোধিত, বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৫, পৃষ্ঠা- ৫২৬

৯৭। নলিনী বেরা, *শবর চরিত, অখণ্ড সংস্করণ,* করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, নভেম্বর ২০১৭, পৃষ্ঠা-৩৪

৯৮। নলিনী বেরা, *শবর চরিত, অখণ্ড সংস্করণ,* করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, নভেম্বর ২০১৭, পৃষ্ঠা-৫২

৯৯। নলিনী বেরা, *শবর চরিত, অখণ্ড সংস্করণ,* করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, নভেম্বর ২০১৭, পৃষ্ঠা – ৩৩

১০০। নলিনী বেরা, *শবর চরিত, অখণ্ড সংস্করণ,* করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, নভেম্বর ২০১৭, পৃষ্ঠা – ৩৩

১০১। মল্লিকা সেনগুপ্ত, *সীতায়ন,* আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, নভেম্বর, ১৯৯৬, পৃষ্ঠা- ১৩

১০২। N. K. Bose, *Tribal Life in India,* N.B.A, India, 2014, p- 2

১০৩। মল্লিকা সেনগুপ্ত, *সীতায়ন,* আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, নভেম্বর, ১৯৯৬, পৃষ্ঠা- ৯৫